মাইকেল স্ট্রগফ

-জুল ভার্ন

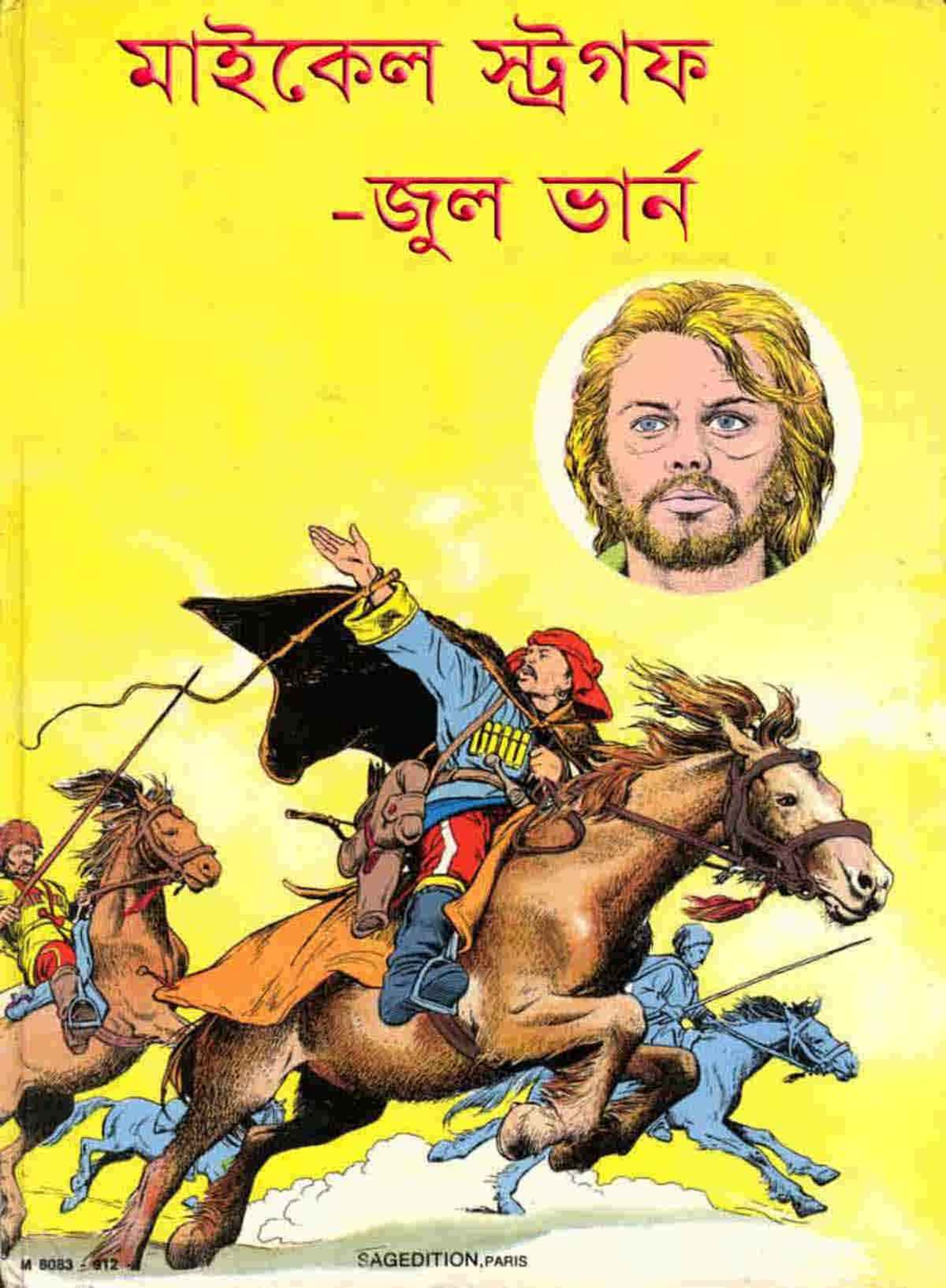

M 8083 - 912 -

SAGEDITION, PARIS

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.07.25 08:56:32 +06'00'

ভবেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

এক

www.boiRboi.blogspot.com

জারের রাজপ্রাসাদ। কয়েক কোটি রুবল খরচ করে মাত্র অল্প কিছুদিন আগে তৈরি হয়েছে এই প্রাসাদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আনা দামী দামী পাথর আর কাচ প্রাসাদের গায়ে, দেয়ালে আর মেজেতে শোভা পাচ্ছে। রাতের বেলা চাঁদের আলো যখন প্রাসাদের গায়ে পড়ে, তখন চারদিকে রংধনুর মতো আলো ঠিক্‌রে বেরোয়। কল্পনার স্বপ্নপুরীও বুঝি হার মেনে যায় এর কাছে।

প্রাসাদের ভেতরটাও সাজানো হয়েছে রাজকীয় রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে। বিদেশ থেকে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা ঝাড়বাতিই আনা হয়েছে কয়েকশো। ইরান থেকে এসেছে রং বেরংয়ের বাহারি গালিচা। এছাড়া বিদেশের নামী-দামী চিত্রশিল্পীদের আঁকা অসংখ্য তেলচিত্র রুমগুলোর দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটু আগে রাত বারোটার ঘণ্টাধ্বনি বেজেছে ; কিন্তু প্রাসাদের আলোকসজ্জা আর লোকজনের হাঁকডাক শুনে মনে হচ্ছে যেন মাত্র সন্ধ্যা। বিরাট বলরুমটায় প্রায় শ'খানেক মেয়ে আর পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় নেচে বেড়াচ্ছে। বলরুমের একপাশে ডাইনিং স্পেস। সেখানে গ্লাস আর দামী মদের বোতল সাজানো রয়েছে। আরো

রয়েছে নানারকম খাবার-দাবার। নাচতে নাচতে কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লেই দু'ঢোক গলায় ঢেলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ; তারপর আবার ফিরে আসছে নাচের আড্ডায়। অতিথিদের কেউ কেউ গল্পগুজবে মত্ত। অন্যদিকে, প্রাসাদচত্বরের বিরাট বাগানটায় লোকনৃত্য আর ঘোড়ার খেলা হচ্ছে। অতিথিদের ভিড় সেখানেও।

আজকের এই বিশেষ উৎসবে যোগ দিয়েছেন রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় হাজারখানেক গণ্যমান্য লোক। এদের মধ্যে বেশির-ভাগই সামরিক বাহিনীর সদস্য। বিদেশী অতিথিও এসেছেন বেশ কয়েকজন। এছাড়া দু'চারজন সাংবাদিককে প্রাসাদের ভেতরে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রাসাদের বাইরে পাহারায় রয়েছে কয়েকশো বন্দুকধারী সিপাই। ওদের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু ওদের অলস ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, বাজনার তালে তালে ওরাও বুঝি বা তন্ময় হয়ে পড়েছে।

অতিথিদের সবাই আমোদ ফুর্তিতে গা ভাসিয়ে দিলেও দুজন বিদেশী সাংবাদিক এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এদের একজন ডেইলী টেলিগ্রাফের হ্যারি ব্লাউন্ট ; অন্যজন ফ্রান্সের এক নামকরা সংবাদ সংস্থার রিপোর্টার, অ্যালসাইড জুলিভেট। লম্বা ছিপছিপে গড়ন দুজনের। ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের গায়ের রং হলদেটে আর ইংরেজ ভদ্র-লোকটি দেখতে প্রায় আপেলের মতো টকটকে লাল। চালচলনে হ্যারি ব্লাউন্ট রাশভারী ধরনের, নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না তার। অ্যালসাইড জুলিভেট আবার এর ঠিক উল্টো। প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে অনর্গল বক্‌বক্ করা তার স্বভাব। অমিল যতোই থাকুক না কেন, একটা ব্যাপারে কিন্তু দুজনের মধ্যে দারুণ মিল। কোথাও কোনো খবরের গন্ধ পেলেই হলো—মাথার

www.boiRboi.blogspot.com

ওপর মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে হলেও খবরটা সংগ্রহ করা চাই-ই। এ ব্যাপারে ভয় ডর কাকে বলে তারা তা জানে না। খবর সংগ্রহে দুজনেই সমান ওস্তাদ। দুজনের মধ্যে এই নিয়ে রেষারেষিও কম নয় —কে কার আগে টাটকা খবরটা লুফে নেবে, সারাক্ষণ যেন এই প্রতিযোগিতাই চলছে।

আজকের এই উৎসবে দুজনের কেউই বিনা কারণে যোগ দিতে আসেনি। ওরা ঠিকই গন্ধ পেয়েছে—কোথাও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা এখনো জানা যায়নি। আর সেজন্যেই দুজনেরই চোখ কান খোলা। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেলেই মনের পর্দায় তা গেঁথে নিচ্ছে ওরা।

রাত বারোটার পর আরো দুঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ বল-রুমের দরজা খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল কিশফ—রাশান সেনাবাহিনীর কয়েকজন বাঘা জেনারেলদের একজন। রুমে ঢুকেই তিনি চলে গেলেন কোণার দিকটায় ; সেখানে আধা সামরিক পোশাক পরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ···। একা একা কি যেন ভাবছেন তিনি। মাথা নুইয়ে সেই ভদ্রলোককে অভিবাদন করলেন জেনারেল কিশফ। তারপর বললেন, 'নতুন খবর এসেছে, হাইনেস।'

'অ্যাঁ?' যেন নিদ্রাভঙ্গ হলো সেই ভদ্রলোকের। জেনারেলের উপস্থিতি এতক্ষণ বোধহয় টেরই পাননি তিনি। একটু ধাতস্থ হয়ে জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নতুন খবর! এবার আবার কি ঘটলো?'

'খবর খুবই খারাপ, টমস্কে টেলিগ্রাম পাঠানো যাচ্ছে না। ওদিককার সবকয়টা লাইনই বিদ্রোহীরা কেটে দিয়েছে। গতকাল

থেকে এই অবস্থা।'

'তার মানে, কাল থেকে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না?'

'জি না, হাইনেস। এরকম চলতে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে সাইবেরিয়ার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর থাকবে না।'

'যেভাবেই হোক, ওদিকটায় খবর পাঠাতেই হবে; নইলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। আচ্ছা, ইরকুটস্কে সৈন্য পাঠানোর হুকুম দেয়া হয়েছে?'

'জি। বৈকাল লেকের ওপারে এটাই ছিলো আমাদের শেষ টেলিগ্রাম; এর পরপরই কানেকশন কেটে যায়।'

'সাইবেরিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে টেলিগ্রামে যোগাযোগ রয়েছে তো?'

'জি, হাইনেস।'

'বিদ্রোহী তাতারদের শেষ খবর কি; ওরা কি ইরতিশ আর ও. বি. আই পর্যন্ত পৌঁচেছে?'

'জি না, হাইনেস। ওরা আরো পেছনে রয়েছে। সেখানে পৌঁছনোর আগেই আমাদের বাহিনীর হাতে ওরা ধরাশায়ী হবে। আমাদের এক বিরাট ব্যাটেলিয়ান ইরতিশ আর ও. বি. নদীর তীর ধরে ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গিয়েছে। এদিকে আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, হাইনেস।'

'কি?' ভুরু কুঁচকে গেলো সেই ভদ্রলোকের।

'বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেফের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি; তবুও লোকটা সম্পর্কে এতটুকু খবরও তারা জোগাড় করতে পারেনি। যেন

www.boiRboi.blogspot.com

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।'

'লোকটা কি সীমান্ত টপকে অন্য কোনো দেশে চলে গেছে বলে মনে হয়?'

'সে-সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ লোকটার ব্যাপারে আমাদের সীমান্ত রক্ষীদের আগে থেকেই সজাগ করে দেয়া হয়েছে।'

'বেশ। এছাড়া অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও আইভানের চেহারার বর্ণনা দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান; এতে করে ওর গা ঢাকা দেয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, লক্ষ্য রাখবেন, সাধারণ লোকেরা এসব গোপন ব্যাপারে কিছুই যেন জানতে না পারে।'

'এক্ষুণি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি; আইভানের ব্যাপারে সাধারণ লোকজন যাতে কিছু জানতে না পারে, তারও ব্যবস্থা নিচ্ছি, হুজুর,' বলে মাথা নুইয়ে আবারো অভিবাদন করলেন জেনারেল কিশফ, তারপর বলরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সম্ভ্রান্ত চেহারার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে জেনারেলের ফিসফাস কথাবার্তা অতিথিদের কেউ লক্ষ্য না করলেও, পুরো ব্যাপারটা দুজন সাংবাদিকের কারুরই চোখ এড়িয়ে গেলো না। এতক্ষণ দুজন ছিলো দু' মাথায়; এবার এক জায়গায় হলো ওরা। দুজনেই দুজনের পেটের খবর বের করার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেলো। অ্যালসাইড জুলিভেটই মুখ খুললো প্রথমে, 'যাই বলুন না কেন, উৎসব কিন্তু বেশ জমেছে।'

'আরে, বেশ কি বলছেন মশাই, বলুন দারুণ জমেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম জমকালো উৎসব জীবনে খুব কমই দেখেছি,' বললো হ্যারি ব্রাউন্ট। 'সবকিছু জানিয়ে একটু আগে আমার পত্রিকায় টেলিগ্রাম করেছি।'

'আমিও ম্যাডেলিনকে টেলিগ্রাম করেছি,' বললো জুলিভেট।

'ম্যাডেলিন! সে আবার কে?'

'আমার কাজিন। খবরাখবর ওর হাত দিয়েই জায়গামতো পৌঁছে যায়।'

'তো আজকের এই উৎসবের সম্পর্কেও জমজমাট খবর পাঠিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ; জানিয়ে দিলাম, উৎসব দারুণ জমেছে, কিন্তু রাশিয়ার বিরাট আকাশে একটু একটু করে কালো মেঘও জমতে শুরু করেছে।'

'আপনার কথা শুনে ১৮১২ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে,' বললো জুলিভেট, 'সেদিনও ছিলো উৎসবের রাত। জারসম্রাট আলেকজাণ্ডারের কাছে খবর এসেছিলো, বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে নিয়েমেন নদী পেরিয়েছে নেপোলিয়ন; ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে সে। খবরটা শুনে একটুও ভাবান্তর হয়নি জারের; বরং উৎসবের যাতে অঙ্গহানি না হয় সেদিকেই তাঁর খেয়াল ছিলো বেশি। জাক্রেট শহরের সেই ঘটনার কথা আপনার মনে আছে, মিঃ ব্রাউন্ট?'

'খুউব; মনে হচ্ছে, এইতো সেদিনের ঘটনা। নেপোলিয়নের বিরাট বাহিনীর হাত থেকে দেশটা যেন কপালগুণেই বেঁচে গিয়েছিলো সেবার। যাই বলুন, দেশের এতবড় বিপদের সময় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের উৎসব নিয়ে মেতে থাকাটা আমারো পছন্দ হয়নি।'

'ওসব কথা থাক। জেনারেল কিশফ কেন এসেছিলো জানেন?'

'জানি। সাইবেরিয়ার শহরগুলোর সঙ্গে এখানকার টেলিগ্রাম যোগাযোগ কেটে দিয়েছে বিদ্রোহীরা—একথাটাই বলতে এসেছিলেন তিনি।'

চোখ কপালে উঠলো জুলিভেটের। ব্যাটা দেখছি দারুণ সেয়ানা;

www.boiRboi.blogspot.com

খবরটা এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে! —মনে মনে ভাবলো সে। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে মুখে বললো, 'নিকোলেভস্কে বিরাট সেনাবাহিনী পাঠানো হচ্ছে, এ খবর জানেন?'

'এ তো পুরনো খবর; নতুন খবর হলো, টোবলস্কয়ের কশাকদের কাছেও জরুরী বার্তা পাঠানো হয়েছে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে তারা যেন সেনাবাহিনী তৈরি রাখে।'

'এতদিন বেশ ঝিম মেরে কাটাচ্ছিলাম, এবার মনে হচ্ছে আরাম হারাম করে খবরের পেছনে ছুটতে হবে।'

'কিন্তু লক্ষণ যেরকম দেখছি তাতে মনে হচ্ছে খবরই আমাদের পেছন পেছন ধাওয়া করবে! আপনার কি মনে হয়, মশিয়ে?'

'ঘটনার গতি প্রকৃতি যেভাবে নিত্য নতুন মোড় নিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক। দেখা যাক, কি হয়,' বললো জুলিভেট। তারপর একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতিথিদের ভিড়ে মিশে গেলো। দুজনেই দুজনের পেটের কথা বের করার আনন্দে বেজায় খুশি।

এমন সময় আবার বলরুমে ঢুকলেন জেনারেল কিশফ। সেই অভিজাত চেহারার ভদ্রলোকটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি।

'কি ব্যাপার জেনারেল, নতুন কোনো খবর এনেছেন মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন সেই ভদ্রলোক।

'জি, হাইনেস। এইমাত্র খবর পেলাম, টমস্কের কাটা লাইনটা আমাদের লোকেরা জোড়া দিতে পেরেছে। কিন্তু টমস্কের পর থেকে নিয়ে ইরকুটস্ক পর্যন্ত কোথাও টেলিগ্রাম পাঠানো যাচ্ছে না—সবকটা লাইনই কাটা।'

'তার মানে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কোনো খবরই পেলেন না!' আক্ষেপ

ঝরে পড়লো ভদ্রলোকটির কণ্ঠে।

'হি, না,' হতাশ কণ্ঠে জবাব দিলেন জেনারেল।

'এক কাজ করুন তাহলে ; চালাক চতুর দেখে একজন রাজদূত পাঠান। সম্ভব হলে কালই ইরকুটস্কের পথে রওনা হয়ে যাক।'

অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল। শীতের রাত ; কিন্তু তবুও দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠেছেন সেই ভদ্রলোক। যেন দম আটকে আসছে তাঁর। বলরুম ছেড়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুঝি বা একটু স্বস্তি মিললো তাঁর। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন দূরের আকাশটার দিকে।

পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলোয় গোটা প্রাসাদটা জ্বলজ্বল করছে। একটু দূরেই দুটো গির্জা আর একটা বড় অস্ত্রাগার। পুরো এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ওপাশে ছোট বড় ভবন, বিরাট একেকটা কেল্লা, বড় বড় গির্জা আর মসজিদ—চাঁদের আলোয় ওগুলোকেও চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা নদী।

নদীর নাম মস্কোয়া ; শহরটার নাম মস্কো। আর পাঁচিল ঘেরা জায়গাটাকে বলা হয় ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের ভেতরেই তৈরি হয়েছে জারের নতুন রাজপ্রাসাদ। আর আধা সামরিক পোশাক পরা অভিজাত চেহারার ভদ্রলোকটি অন্য কেউ নন—তিনিই রাশিয়ার মহামান্য জার।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু সাইবেরিয়া। এর আরেক নাম এশিয়াটিক রাশিয়া। উরাল পর্বতমালা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত প্রায় আঠারো লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এই সাইবেরিয়া। আয়তনে বিরাট হলেও লোকসংখ্যা মাত্র কুড়ি লক্ষ। গোটা এলাকাটা প্রায় সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকে। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বরফ আর বরফ। আবাদী জমির পরিমাণ খুব কম। এই অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের বেশিরভাগই নানা ধরনের অপরাধী। বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দিয়ে অপরাধীদের এখানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। শাস্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে এখানেই থেকে যায় ; কেউ বা ফিরে যায় নিজ এলাকায়।

সাইবেরিয়াতে যাতায়াত ব্যবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। রেল লাইন এখনো বসেনি। গরমের সময় তেলগা কিংবা কিরিক আর শীতকালে স্লেজে চড়ে লোকজনেরা যাতায়াত করে।

পূর্ব এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন দুজন গভর্ণর জেনারেল। এঁদের একজন মহামান্য জারের ভাই, গ্র্যাণ্ড ডিউক। পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্কে বিরাট এক রাজ-

প্রাসাদ রয়েছে তাঁর। অত্যন্ত দক্ষ শাসনকর্তা এই গ্র্যাণ্ড ডিউক। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আইভান ওগারেফকে তিনিই সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন ; পরে কোনো এক সময় মহামান্য জার আইভানকে ক্ষমা করে দেন।

মাত্র একটা টেলিগ্রাফ লাইনের সাহায্যে মস্কোর সঙ্গে সাইবেরিয়ার খবর দেয়া নেয়া চলে। বিদ্রোহীরা এই টেলিগ্রাফের তার কয়েক জায়গায় কেটে দিয়েছে। যে-সব জায়গায় দুষ্কৃতকারীরা তার কেটে দিয়েছে, সেসব অঞ্চলের সঙ্গে মস্কোর যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি কি, তা না জেনে কেউই আর সাইবেরিয়ার দিকে যেতে চাচ্ছে না। সেখানকার লোকজনও মস্কোর কোনো খবর পাচ্ছে না।

এদিকে আইভান ওগারেফ যে তাতার বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, গ্র্যাণ্ড ডিউক সে-খবর জানেন না। মহামান্য জার তাই ঠিক করেছেন, একজন বুদ্ধিমান রাজদূতকে শিগগির সাইবেরিয়ায় পাঠাতে হবে। নইলে দারুণ বিপদে পড়ে যাবেন গ্র্যাণ্ড ডিউক।

প্রাসাদের উৎসব প্রায় শেষ। ভোর হতে আর সামান্য বাকি। এমন সময় পুলিশ চীফকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখা গেলো। ঢুকেই সোজা চলে গেলেন মহামান্য জারের স্টাডি রুমে। জার তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখেই পুলিশ চীফকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'বসুন জেনারেল ; আইভান ওগারেফের ব্যাপারে সবকিছু জানার জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি আমি।'

'ভয়ঙ্কর লোক এই আইভান।'

'আগে সে সেনাবাহিনীতে ছিলো, তাই না ?'

'জ্বি, হাইনেস, সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল ছিলো সে। অফিসার হিসেবে সে ছিলো দারুণ করিৎকর্মা এবং সেইসঙ্গে বিপজ্জনক। গ্র্যাণ্ড ডিউকের বিরুদ্ধে বার কয়েক ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করেছিলো। প্রথম দিকে একাধিকবার তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তাতেও তার শয়তানি একটুও কমেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে সাইবেরিয়ায় পাঠান গ্র্যাণ্ড ডিউক।'

'এসব কদ্দিন আগের কথা ?' উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেলো জারের কণ্ঠে।

'এসব প্রায় দু'বছর আগেকার কথা, হাইনেস। সাজা পাবার ছ'মাস পর আইভানকে আপনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ; এরপর রাশিয়ায় ফিরে আসে সে।'

'তারপর ? সাইবেরিয়াতে আর কখনোই যায়নি সে ?'

'নির্বাসন থেকে ফিরে এসেও বার ছয়েক সাইবেরিয়ায় গেছে আইভান,' নিরস কণ্ঠ পুলিশ চীফের, 'অথচ এমন দিনও ছিলো, যখন একবার কাউকে সাইবেরিয়াতে পাঠালে তাকে আর ফিরে আসতে দেয়া হতো না,' অপরাধীদের ব্যাপারে জারের উদার মনোভাবকে খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারলেন না পুলিশ চীফ।

পুলিশ চীফের খোঁচা গায়েই মাখলেন না জার। বরং গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, সাইবেরিয়া থেকেও কয়েদীরা ফিরে আসতে পারবে।'

পুলিশ কিংবা গোয়েন্দাদের ইচ্ছে নয়, অপরাধীরা ক্ষমা পেয়ে সাইবেরিয়া থেকে ফিরে আসুক। কিন্তু এখনকার জার এদের মতামতের ধার ধারেন না। দয়ার শরীর তাঁর ; অনেক ফাঁসীর আসামীকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

আগের কথার খেই ধরে জিজ্ঞেস করলেন জার, 'সাইবেরিয়া থেকে সে কি রাশিয়াতে আর ফিরে আসেনি? সে যদি ফিরে এসেই থাকে তো পুলিশ তার খোঁজ পাচ্ছে না কেন?'

চেহারা গম্ভীর হলো পুলিশ চীফের। বললেন, 'বেয়াদবি মাফ করবেন, ইয়োর এক্সিলেন্সী। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোনো দাগী আসামীকে একবার ক্ষমা করা হলে পরবর্তীতে সে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আমাদের বাহিনী আইভানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে; আশা করা যায় কয়েকদিনের মধ্যেই কুচক্রী-টার সমস্ত খবরাখবর আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ বের করে ফেলবে।'

পুলিশ চীফের জ্ঞান দান করার ভঙ্গিতে কথা বলাটা বেশি পছন্দ হলো না জারের। তাই গলার স্বর খানিকটা চড়লো তাঁর, 'আই-ভানকে শেষ কোথায় দেখা গেছে, জানেন?'

'পার্ম প্রদেশে।'

'কি করছিলো সে সেখানে?'

'কিছুই না। বেকার ভবঘুরের মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়া-চ্ছিলো।'

'তারপর?'

'মার্চের মাঝামাঝি পার্ম ছেড়ে চলে যায় সে। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ আর কোনো খবর পায়নি তার,' মিনমিনে গলায় বললেন চীফ।

'তার মানে,' স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেলো জারের কণ্ঠে, 'মার্চের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আইভানের কোনো খবরই জোগাড় করতে পারছেন না আপনারা?'

'আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, হাইনেস,' বলে মাথা নিচু করে

www.boiRboi.blogspot.com

দাঁড়িয়ে রইলেন পুলিশ চীফ।

'বেশ, আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যান,' মেজাজ একটু শান্ত হলো জারের, 'এদিকে অন্য মাধ্যমে আমি কিছু উড়ো খবর পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান ঘটনাচক্রে মনে হচ্ছে, খবরগুলো মোটেই উড়ো নয়।'

চমকে উঠলেন চীফ। বললেন, 'আইভান কি তাতার বিদ্রোহী-দের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আরো জানা গেছে, পার্ম থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আবার সাইবেরিয়ায় ঢোকে সে। সেখান থেকে কিরঘিজ এলা-কায় ঢুকে যাযাবরদের উশ্‌কে দেয়। তারপর আরো দক্ষিণে গিয়ে তুর্কিস্থানে ঢুকে পড়ে। সেখানে গিয়ে বোখারা, খুখণ্ড আর কুণ্ডুজের শাসনকর্তাদের মস্কোর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে সে। সাইবেরিয়ায় আজ যা ঘটছে তা বিরাট এক ষড়যন্ত্রের সামান্য একটা অংশ। আমা-দের শত্রু কেবল তাতার বাহিনীই নয়—আরো অনেকে। আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যেভাবেই হোক, গ্র্যাণ্ড ডিউককে সতর্ক করে দেয়া। কারণ আইভানের ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে তাঁর ওপর।'

আইভানকে ক্ষমা না করলে এতসব কিছুই ঘটতো না—মনে মনে ভাবলেন চীফ। কিন্তু মুখে বললেন, 'তাতার কিংবা অন্যান্য বিদ্রোহী-দের দমন করার কি কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, হাইনেস?'

'হ্যাঁ; এরই মধ্যে দুটো সেনাদল সাইবেরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে। দু'দিক থেকে ওরা বিদ্রোহীদের ওপর চড়াও হবে। কিন্তু সৈন্য পৌঁছতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যাবে; বিদ্রোহীদের ব্যাপারে এর আগেই গ্র্যাণ্ড ডিউককে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'গ্র্যাণ্ড ডিউক কি জানেন, সেনাবাহিনী পাঠানো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। এ খবরটা জানানোর পরপরই টেলিগ্রাফ কানেকশন কেটে

যায়। কিন্তু যে খবরটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই তাঁকে জানানো যায়নি।'

'সেটা কি, হাইনেস?'

'আইভানই যে বিদ্রোহের হোতা গ্র্যাণ্ড ডিউক তা জানেন না। গ্র্যাণ্ড ডিউকের ওপর শয়তানটার আক্রোশ রয়েছে। যতদূর জানা গেছে, ছদ্মবেশে ইরকুটস্ক পৌঁছে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কোনো দফতরে কাজ নেবে আইভান; একটু একটু করে গ্র্যাণ্ড ডিউকের মন জয় করার চেষ্টা করবে। তাতার ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা যখন ইরকুটস্ক আক্রমণ করবে, ঠিক তখনই সে বিশ্বাসঘাতকতা করে শহরের পতন ঘটাবে। যে করেই হোক, খবরটা গ্র্যাণ্ড ডিউককে জানাতেই হবে।'

'এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজদূত পাঠানো। চালাক চতুর দেখে কাউকে যদি পাঠানো যায় তাহলে...।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি,' পুলিশ চীফকে কথা শেষ করতে দিলেন না জার, 'জেনারেল কিশফ এরকম একজনের খোঁজ পেয়েছেন।'

'কেবল চালাক চতুর হলেই হবে না, হাইনেস। এ কাজের জন্যে যাকে পাঠানো হবে, তাকে শক্ত সমর্থ এবং লড়াকু মেজাজের হতে হবে—কারণ, আমাদের একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, যতো বদমাইশ, দাগী আর চোর ছ্যাঁচোড়ের আড্ডা এই সাইবেরিয়ায়।'

আবারো চড়লো জারের কণ্ঠস্বর। বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, যে সমস্ত অপরাধীদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে তারা সবাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলাবে?'

সুর নরম হলো পুলিশ চীফের, 'আমি ঠিক সেকথা বলিনি, হাইনেস। কিছু কিছু দাগী অপরাধী সবসময়েই সুযোগের অপেক্ষায়

থাকে; মওকামতো তারা বিদ্রোহ কিংবা যে কোনো সরকার বিরোধী কাজে মদদ জোগায়।'

'দাগী আসামীদের কথা থাক: রাজনৈতিক মত পার্থক্যের জন্যে যাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, তারা? তারাও কি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে?'

'জি না, হাইনেস। রাজনৈতিক কারণে যারা নির্বাসিত, তারা আর যাই করুক না কেন, বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশের ক্ষতি করবে না।'

মেজাজ নরম হলো জারের। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি তাহলে এখন আসুন; নতুন কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে যাবেন।'

অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন চীফ। একা জার বসে রইলেন স্টাডি রুমটায়—মাথায় তাঁর ঘুরপাক খাচ্ছে হাজারো চিন্তা।

কিরঘিজ এলাকার পুরোটাই একটা তাঁবু শহর। প্রায় লাখ চারেক তাঁবুতে কুড়ি লাখ লোক বসবাস করে। কিরঘিজদের সবাই একসাথে বিদ্রোহ করে বসলে সামলানো মুশকিল হবে। এমন কি রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

ভালো যোদ্ধা হিসেবে কিরঘিজদের তেমন সুনাম নেই। কিন্তু লুটপাট আর চুরি ডাকাতিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। সামনা সামনি যুদ্ধে এদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে ছোট একটা সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কিরঘিজ খুনে আর লুটেরাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সত্যিই মুশকিল। একটা মাঝারি ধরনের সেনাবাহিনী পাঠাতে পারলে বিদ্রোহ করার মজাটা বেশ ভালোভাবেই টের পাইয়ে দেয়া যায়। কিন্তু হাতে সময় কই! মস্কো থেকে কিরঘিজ এলাকার

www.boiRboi.blogspot.com

দূরত্ব তিন হাজার ভার্স্টের কম নয়। সেনাবাহিনী পৌঁছনোর আগেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, বিদ্রোহী তাতারদের মোকাবিলা করাও এখন দারুণ এক সমস্যার ব্যাপার। পূর্ব এবং পশ্চিমে সাইবেরিয়ার গুটিকয়েক সেনা ডিভিশন এদের সঙ্গে পেরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অবশ্য এরই মধ্যে বিরাট এক সেনাবাহিনী সাইবেরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে—এরা পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্কে পৌঁছে গ্র্যাণ্ড ডিউকের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু এখানেও সেই একই কথা, এতো সময় কোথায়! সৈন্য পৌঁছনোর আগ পর্যন্ত তাতার বাহিনীকে কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

গোটা তুর্কিস্তান জুড়েই তাতারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তুর্কিস্তান আবার কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত যেমন, খুখণ্ড, কুণ্ডুজ আর বোখারা। এগুলোর মধ্যে বোখারাই সব দিক দিয়ে উন্নত। প্রদেশটাকে ঘিরে রয়েছে উঁচু নিচু পাহাড়। এজন্যে বাইরের কোনো শক্তিই বোখারায় হামলা চালিয়ে সুবিধা করতে পারে না। এছাড়া বোখারার অধিবাসীদের সবাই একেকজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

বোখারার বর্তমান আমীর ফিওফার খানের নাম জানে না এমন লোক তুর্কিস্তানে আছে কিনা সন্দেহ! যেমন সাহসী তেমনি ভয়ঙ্কর এই ফিওফার খান। অত্যাচার আর খুন জখমে জুড়ি নেই তার। আইভান ওগারেফের প্ররোচনায় এবারে গ্র্যাণ্ড ডিউককে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে নেমেছে সে। প্রায় ষাট হাজার পদাতিক আর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইরকুটস্কের দিকে ধেয়ে আসছে ফিওফার খান। যেখানে যা কিছু পাচ্ছে, সব লুট করছে নয়তো ধ্বংস করে দিচ্ছে। দুধের শিশু থেকে নিয়ে আশি বছরের বৃদ্ধও তার হাত থেকে রেহাই

www.boiRboi.blogspot.com

পাচ্ছে না। যুবতী মেয়েদের আপাততঃ বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে এদের জায়গা হবে হারেমখানায়।

গ্র্যাণ্ড ডিউক হয়তো ভাবতেও পারছেন না, কি সাংঘাতিক বিপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। যে করেই হোক এ ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? এমন কেউ কি আছে, যে নাকি হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে পারবে? —ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়লেন জার।

তিন

জারের স্টাডি রুমের দরজা খুলে গেলো। ভেতরে ঢুকলেন জেনারেল কিশফ। জারের চোখেমুখে খানিকটা আশার আলো ফুটে উঠলো যেন! ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'উপযুক্ত কাউকে পাওয়া গেলো, জেনারেল?'

'জ্বি, হাইনেস। লোকটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি; বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'বেশ। কিন্তু এ-ধরনের কাজে তার অভিজ্ঞতা আছে তো?'

'জ্বি। এর আগেও সে এই ধরনের কাজ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে।'

'হুঁ; বাড়ি কোথায় লোকটার?'

'সাইবেরিয়াতেই। ওমস্ক শহরে। সেখানেই সে বড় হয়েছে।'

'এরকম বিপজ্জনক কাজের জন্যে বুদ্ধিমান হওয়া দরকার ; সেই সঙ্গে সাহসও থাকা চাই। লোকটা পারবে তো, জেনারেল ?'

'পারবে, হাইনেস। ওর ব্যাপারে সবকিছুই জেনেছি আমি। যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমান ; স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়েও একেবারে খাঁটি সোনা।'

'এসব কাজে কেবল বুদ্ধিমান আর সাহসী হলেই চলবে না ; সবকিছু সইবার মতো শরীর স্বাস্থ্যও থাকা চাই।'

'শিকারী বাপের সন্তান সে। বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষ ; শরীরটাও ঠিক তেমনি ইস্পাতের মতো মজবুত।'

'কখন রওনা হতে পারবে সে ?'

'আপনি হুকুম করলে এখনই, হাইনেস।'

'বেশ, তাকে ভেতরে আসতে বলুন। আর হ্যাঁ, কি যেন নাম লোকটার ?'

'মাইকেল স্ট্রগফ।'

ভেতরে ঢুকে মহামান্য জারকে অভিবাদন করলো মাইকেল। অবাক চোখে তিনি চেয়ে রইলেন মাইকেলের দিকে। লম্বা চওড়া শরীর, ককেশিয়ানদের মতো কাটা কাটা চেহারা। কপালের ওপর খেলা করছে একগুচ্ছ ঢেউ খেলানো চুল। চোখের দৃষ্টিতে যেন মমতা উপচে পড়ছে ; কিন্তু গোটা চেহারায় এমন একটা তেজীভাব ফুটে বেরুচ্ছে যে দেখেই বোঝা যায়—কর্তব্যে অবহেলা কি জিনিস, তা জানে না এ-লোক।

মাইকেলের জন্ম সাইবেরিয়ার ওমস্কে। শহরটা জঙ্গল আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওর বাবা পিটার স্ট্রগফ ছিলো একজন শিকারী। ভালুক

www.boiRboi.blogspot.com

শিকারে সুনাম ছিলো তার। বাপ যখন শিকারে বেরুতো, ছেলেও তার সঙ্গ নিতো। বাপের শিকার করা ভালুকগুলোর ছাল ছাড়িয়ে নেয়ার দায়িত্ব থাকতো মাইকেলের ওপর। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ভালুক শিকারের হাতেখড়ি হয় তার। এরপর থেকে একাই সে বেরিয়ে পড়তো শিকারে। খেয়ে না খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো শিকারের খোঁজে। আর তখন থেকেই ঠাণ্ডা-গরম কিংবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা সইবার আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মেছে তার মাঝে। মাইকেলের আর একটা অসাধারণ গুণ, পথ চলতে গিয়ে কখনোই দিক হারায় না সে। অচেনা জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেও সে ঠিক ঠিক দিক চিনে বাড়ি ফিরতে পারে।

কুড়ি বছর বয়সে জারের রাজদূত বাহিনীতে যোগ দেয় মাইকেল। মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঐ বাহিনীর চীফ অফিসার হিসেবে পদোন্নতি হয় তার। দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোক মারফত কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পৌঁছনোর দরকার পড়লে মাইকেলের ডাক পড়বেই। দায়িত্ব যত কঠিনই হোক না কেন, মাইকেলের ওপর তা চাপিয়ে দিয়ে কর্মকর্তারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। কারণ তাঁরা জানেন, প্রাণ গেলেও কর্তব্যে অবহেলা করবে না সে। এর স্বীকৃতিও সে পেয়েছে বহুবার। তার জামার পকেটে লাগানো পদকগুলোর দিকে এক নজর চাইলেই তা বোঝা যায়।

মাইকেলের বাবা মারা গিয়েছে প্রায় বছর দশেক আগে। আপন বলতে একমাত্র বুড়ি মা-ই বেঁচে রয়েছে। বুড়ির নাম মার্কা স্ট্রগফ। ওমস্কে নিজের বাড়িতেই থাকে সে। এই বুড়ি মাকে নিয়েই যত ভাবনা মাইকেলের। বছরের এই সময়টা সে ছুটি পায়—আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় মায়ের কাছে। প্রতি বছরের মতো এবারও বাড়ি

যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো সে। কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেলো! বাড়ি যাবার সব আয়োজন এখন শিকেয় তুলে তাকে ছুটতে হবে ইরকুটস্কের দিকে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে মাইকেলের দিকে চেয়ে থাকার পর নিরবতা ভাঙলেন জার, 'কি নাম তোমার?'

নিজের নাম বললো মাইকেল।

'তুমি কি রাজদূত বাহিনীর সদস্য?'

'জ্বি, হাইনেস। রাজদূত বাহিনীর চীফ অফিসার আমি।'

'সাইবেরিয়ার রাস্তাঘাট তোমার চেনা?'

'জ্বি; সাইবেরিয়াতেই জন্ম আমার।'

'কোন্ শহরে?'

'ওমস্কে।'

'সেখানে তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে?'

'মা আছেন। আত্মীয় স্বজন বলতে মা ছাড়া আর কেউ নেই আমার।'

'বেশ। তো কখন রওনা হতে পারবে তুমি?'

'হুকুম করলে এখনি, হাইনেস।'

বেশ বোঝা গেলো, মাইকেলের কথায় খুশি হয়েছেন জার। টেবিল থেকে একটা খাম তুলে মাইকেলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'ইরকুটস্কে পৌঁছে এই চিঠিটা তুমি গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু সাবধান, চিঠিটা যেন অন্য কারো হাতে না পড়ে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হাইনেস। চিঠিটা আমি গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতেই পৌঁছে দেবো।'

www.boiRboi.blogspot.com

'পথে বিদ্রোহীদের সাথে তোমার মোলাকাত হতে পারে। এছাড়া আইভান ওগারেফের অনুচরেরাও ওঁৎ পেতে রয়েছে। তারা চাইবে, এই চিঠি যেন গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে না পৌঁছয়।'

'আমি চোখ কান খোলা রেখেই পথ চলবো। পথে শত্রুদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য থাকবে আমার।'

'তুমি কি ওমস্ক হয়ে যাবে?'

'জ্বি, যাবার পথ তো ঐ একটাই।'

'কিন্তু ওমস্কে পৌঁছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেয়ো না; এতে শত্রুদের কাছে তোমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।'

দ্বিধায় পড়ে গেলো মাইকেল; মায়ের সঙ্গে আজ কতদিন দেখা নেই তার। ওমস্কে যাবে, অথচ মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না; এ যেন ভাবতেই পারছে না সে। কিন্তু তবু মুখে বললো, 'আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো, হাইনেস।'

জার এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। গলার স্বর গম্ভীর হলো তাঁর। বললেন, 'এই চিঠি পৌঁছে দেয়া না দেয়ার ওপরই নির্ভর করছে গোটা সাইবেরিয়ার ভবিষ্যৎ আর গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হাইনেস। এই চিঠি আমি গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতেই পৌঁছে দেবো।'

'কিন্তু পথে যদি কোনো বিপদ আপদ হয়?'

'যত বিপদই আসুক না কেন, দায়িত্ব থেকে একচুলও নড়বো না আমি—অবশ্য মৃত্যু হলে আলাদা কথা।'

'আমি আশীর্বাদ করছি, মাইকেল, ঈশ্বরের দয়ায় আরো বহুদিন বেঁচে থাকবে তুমি।'

'ঈশ্বরের দয়া আর আপনার আশীর্বাদ আমার চলার পথের সব-চাইতে বড় অবলম্বন, হাইনেস।'

'বেশ, তাহলে আর দেরি কোরো না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো।'

অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো মাইকেল।

'মানুষ তো নয়, যেন খাঁটি সোনা।'

জেনারেল কিশফও জারের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'কাজটা করার মতো কোনো লোক যদি থেকে থাকে, তবে সে এই মাইকেল স্ট্রগফ।'

জুলাই মাসে সাইবেরিয়ায় বরফ গলতে শুরু করে। কিন্তু জুন পর্যন্ত সেখানে কড়া শীত থাকে। ঐ সময় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা রীতিমতো বিপজ্জনক। পথঘাট প্রায় সারাদিনই ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে। খাল-বিল, নদী-নালা সবকিছু জমে একাকার হয়ে যায়। পথচারীরা পথের নিশানা হারিয়ে ফেলে। আর রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আরো আছে তুষার ঝড়। ঝড়ে বাড়িঘর শুদ্ধ বরফের নিচে চাপা পড়ে যায়। এই সময় হায়না আর নেকড়ের দল জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। শিকারের আশায় তারা লোকালয় পর্যন্ত ছুটে যায়; এবং সুযোগ পেলেই লোকজনের ওপর হামলা চালায়।

এসব নানান অসুবিধার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শীতকালে কেউ সাইবেরিয়ায় যায় না। কিন্তু মাইকেলের জন্যে শীতকাল কোনো সমস্যাই নয়। বরং সাইবেরিয়ায় এখন শীতকাল হলে সে বেশি খুশি হতো। কারণ বিদ্রোহী কিংবা যাযাবরেরা শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঘরে কিংবা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতো। রাস্তাঘাটে গুণ্ডা

www.boiRboi.blogspot.com

কিংবা লুটেরাদের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনাও কম। এছাড়া শীতকালে স্লেজের সুবিধা পাওয়া যায়। এতে পরিশ্রম হয় কম, আর সময়ও বেঁচে যায় অনেক। কিন্তু এখন আর এসব সুবিধা অসুবিধা বিচার করার সুযোগ নেই মাইকেলের—দেশের প্রয়োজনটাই এখানে বড় কথা। তাই যে করেই হোক, তাকে যেতে হবে সাইবেরিয়ায়। মনে মনে তৈরি হলো সে।

যাতায়াত ও অন্যান্য খরচের জন্যে সরকারের তরফ থেকে মাইকেলকে বেশ কিছু টাকা দেয়া হলো। সেই সঙ্গে সে আরো পেলো একটা ছাড়পত্র। তাতে যা লেখা ছিলো তা মোটামুটি এরকম:

নাম: নিকোলাস কোর্পানফ।
ঠিকানা: ইরকুটস্ক, সাইবেরিয়া।
পেশা: ব্যবসা।

এই ছাড়পত্র তাকে দেশের যে কোনো জায়গায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিচ্ছে। প্রয়োজনে এক কিংবা দুই জন ভ্রমণ-সঙ্গীও সে নিতে পারবে। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে এই ছাড়পত্র কোনো অবস্থাতেই বাতিল হবে না।

রাজদূতদের জন্যে সরকারী ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। মাইকেল ইচ্ছে করলে এরকম একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করতে পারতো; কিন্তু এতে ওর আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাই আরামদায়ক ঘোড়ার গাড়ির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ যাত্রীর পোশাকে সে হাজির হলো মস্কো রেল স্টেশনে। কারণ এখন থেকে সে আর রাজদূত মাইকেল স্ট্রগফ নয়; একজন সাধারণ ব্যবসায়ী সে। বাড়ি সাইবেরিয়ার ইরকুটস্কে। আর নাম? —নিকোলাস কোর্পানফ।

চার

১৬ জুলাই। ভোরের আলো এখনো ফুটে বেরোয়নি। আর একটু পরেই রওনা হবে মাইকেল। প্রথমে মস্কো থেকে যেতে হবে নিজনি-নভগরড। ট্রেনে করে গেলেও পৌঁছতে পাক্কা দশ ঘণ্টা লেগে যায়। সেখানে পৌঁছে বিদ্রোহীদের খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করবে সে। তারপর ট্রেনে কিংবা স্টীমারে চেপে তাকে উরাল অঞ্চলের দিকে যেতে হবে। সম্ভব হলে ট্রেনেই যাবে। স্টীমারে করে গেলে ভলগা নদী পেরুতে হবে। এতে সময় লেগে যাবে অনেক বেশি।

ভোরবেলায় মস্কো স্টেশনে এসে হাজির হলো মাইকেল। পরনে তার ঢিলেঢালা পোশাক। পায়ে হাই বুট। কোমরে চওড়া বেল্ট আর পিঠে ন্যাপস্যাক—দেখে মনে হচ্ছে বিদেশী কোনো সওদাগর। আর মাইকেলও তাই চায়। যতো বেশি সময় আসল পরিচয় গোপন রাখা যায় ততই তার জন্যে সুবিধা।

পথে নানারকম বিপদ আপদ হতে পারে ভেবে সঙ্গে একটা পিস্তল নিয়েছে সে। আরো নিয়েছে একটা ইয়াতাঘান—ভালুক শিকারের ছোরা। সওদাগরের কাছে পিস্তল বা ড্যাগার দেখতে পেলে লোকজন সন্দেহ করে বসবে। তাই জিনিস দুটোকে জামার নিচে লুকিয়ে রেখেছে সে।

www.boiRboi.blogspot.com

ট্রেন এলো। একমুহূর্ত দেরি না করে সুবিধামতো একটা কামরায় উঠে পড়লো মাইকেল। উঠেই যুতসই একটা আসন দখল করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ কামরার সবক'টা আসন দখল হয়ে গেলো। এর পরেও আরো কয়েকজন যাত্রী এলো; কিন্তু তাদের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় রইলো না। একটু পরেই হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

মাইকেল ভেবেছিলো, শরীরটাকে কায়দা করে এলিয়ে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু যাত্রীদের বকবকানির চোটে ইচ্ছাটা আপাততঃ শিকেয় তুলতে হলো। চোখ বন্ধ করে ঝিম মেরে পড়ে রইলো সে। কান দুটো সজাগ রাখলো—যাত্রীরা কে কি বলে, তা শোনার জন্যে।

যাত্রীদের বেশিরভাগই ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে রয়েছে ইহুদী, কশাক, রাশান, জর্জিয়ান আর তুর্কিস্তানের ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ভাষার কথাবার্তা একসঙ্গে মিলে গিয়ে অনেকটা পাখির কিচির মিচিরের মতো শোনাচ্ছে। সবার একটাই গন্তব্যস্থল—নিজনি-নভগরড। প্রতি বছরের মতো এবারেও সেখানে শিল্পমেলা বসেছে। এই মেলায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই কিছু না কিছু জিনিসপত্র আসে।

এই মেলার ব্যাপার নিয়েই যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল। মাঝে মধ্যে অবশ্য রাজনৈতিক সমস্যাও এদের আলোচনায় স্থান পাচ্ছে।

টুপি মাথায় একটা লোক পাশের সহযাত্রীকে বললো, 'শুনলাম, এবার নাকি চায়ের দামটা বেশ চড়েছে।'

'সে-কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো, এবারের মেলায় নাকি বোখারার কার্পেট আসছে না?' পাল্টা প্রশ্ন করলো

সহযাত্রী।

'ঠিকই শুনেছো তুমি ; আর কারণটাও নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো,' বললো প্রথমজন, 'তবে যা-ই বলো না কেন, বোখারার কার্পেট ছাড়া মেলা খুব একটা জমবে বলে মনে হয় না।'

কামরার অন্যদিকে কয়েকজন আবার রাজনীতি নিয়েও মেতে উঠেছে। খুব সতর্কভাবে আলাপ করছে ওরা। সরকার বিরোধী কোন কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলেই বিপদ। গোয়েন্দারা কে কোথায় ওঁৎ পেতে রয়েছে কে জানে। যাত্রীদের একজন তার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরঘিজদের খবর কিছু জানেন? শুনলাম, ওরা নাকি তাতারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?'

'শুনছি তো সেরকমই,' গলার স্বর খাদে নামিয়ে দ্বিতীয়জন বললো, 'কিন্তু ঘটনা আরো কদ্দূর গড়িয়েছে কে জানে!'

'ভাবচক্কর দেখে যা মনে হচ্ছে, তাতে এবারের মেলাটাই শেষে না ভণ্ডুল হয়ে যায় আবার!'

'মেলা পণ্ড হয় হোক ; দেশের নিরাপত্তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে-দিকে আমাদের কড়া নজর রাখতে হবে,' জনদরদী নেতার মতো বলে উঠলো প্রথমজন।

গোয়েন্দাদের ভয়ে সবাই কেমন মেপে মেপে কথা বলছে। লোক-টার কথা শুনে মনে মনে খুব একচোট হাসলো মাইকেল।

কামরার একেবারে কোণার দিকে চলছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এক বিদেশী লোক, বিদ্রোহের ব্যাপারে যাত্রীদের নানারকম প্রশ্ন করে যাচ্ছে, যাত্রীরাও যতোটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে উত্তর দিচ্ছে। অনেক কায়দা করে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রশ্ন করছে লোকটা ; কিন্তু মনমতো উত্তর পাচ্ছে না। কারণ অনেকেই লোকটাকে স্পাই ঠাউরে বসেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে লোকটাকে মৃদু ধাক্কা দিলো মাইকেল। এতে লোকটা গেলো ক্ষেপে। মুখ ভেংচে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো ; কিন্তু মাইকেলের রক্তচক্ষুর দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিলো। মেয়েটার কাছ থেকে এবার খানিকটা সরে বসলো সে। আড়চোখে মেয়েটার দিকে চাইলো মাইকেল। দেখলো, টানা টানা চোখ দুটোতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।

এর মধ্যে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে। নিজনি-নভগরড এখনো অনেক দূরে। ট্রেন চলছে তো চলছেই। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো ট্রেনটা। যাত্রীরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো ট্রেন। আসলে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি। মোড় ঘুরতে গিয়ে লাইন থেকে সরে গিয়েছিলো ট্রেনটা। অবশ্য ড্রাইভার দক্ষ হাতে গাড়ি থামিয়ে ফেলায় মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে এ যাত্রা বেঁচে গেলো সবাই। কিন্তু লোকজনের মন থেকে ভয় দূর হলো না। ট্রেনের কামরা ছেড়ে কে কার আগে বাইরে বেরুবে এ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। এত হৈ হট্ট-গোলের মধ্যেও মেয়েটা কিন্তু একচুলও নড়লো না ; নিজের আসনে চুপচাপ বসে রইলো। মনে মনে মেয়েটার ঠাণ্ডা মাথার প্রশংসা না করে পারলো না মাইকেল।

দুর্ঘটনার কারণটা ভালোভাবে জানা গেলো। ট্রেনটা যাচ্ছিলো বেশ জোরে। একটা ব্রিজের কাছে এসে যখন সেটা মোড় ঘুরছিলো তখন পেছন দিককার লাগেজ বগির আংটা ভেঙে যায়। আর তাতেই ট্রেনটা লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। ড্রাইভারটা ছিলো খুবই পাকা ; দক্ষ হাতে গাড়ির স্পীড কমিয়ে এনেছিলো সে। নইলে যাত্রীশুদ্ধ ট্রেনটা গিয়ে পড়তো পাশের খালে।

দুর্ঘটনার জন্যে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি দেরি হয়ে গেলো। রাত আটটার সময় ট্রেন নিজনি-নভগরড পৌঁছলো। গাড়ি স্টেশনে থামতেই পুলিশের লোকজন কামরাগুলোয় ঢুকে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করলো। মাইকেলের ছাড়পত্রে একবার চোখ বুলিয়ে সেটা ফিরিয়ে দিলো পুলিশ অফিসার। কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ করলো না। অফিসার এবার মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে অফিসারের দিকে বাড়িয়ে দিলো। কাগজটা সাধারণ একটা অনুমতিপত্র। অফিসার কয়েকবার সেটা উল্টেপাল্টে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি রিগা থেকে এসেছেন?'

'জি,' ছোট করে উত্তর দিলো মেয়েটা।

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'ইরকুটস্কে।'

একটু অবাক হলো অফিসার। এতটুকু মেয়ে; সে কিনা একলা একলা ইরকুটস্ক যাচ্ছে। কিন্তু গলার গাম্ভীর্য ঠিক রেখে আবার জিজ্ঞেস করলো সে, 'কোন্ পথে ইরকুটস্ক যাবেন?'

'আমি পার্ম হয়ে যাবো।'

'বেশ। নিজনি-নভগরড পুলিশ স্টেশনে গিয়ে এই অনুমতি পত্রে নতুন একটা সীল মেরে নেবেন; ভুলে গেলে কিন্তু মুশকিলে পড়তে হবে।'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো মেয়েটা।

মাইকেল এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলো। মেয়েটা একা একা ইরকুটস্ক যাচ্ছে শুনে চোখ কপালে উঠলো তার। জরুরী কাজ থাকলেও তাতারদের ভয়ে এখন কেউই সেখানে যেতে চায় না।

www.boiRboi.blogspot.com

অথচ মেয়েটা চলেছে একেবারে একা! কিন্তু কেন? কি কাজ ওর ইরকুটস্কে? —মনে মনে ভাবতে লাগলো মাইকেল।

পুলিশ অফিসার তার কাজ শেষ করে কামরা থেকে নেমে গেলো। একটু পরে সবক'টা কামরার দরজা খুলে দেয়া হলো। কে কার আগে নামবে, তাই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেলো। ভিড়ের মধ্যে টুপ করে নেমে গেলো মাইকেল; নামলো মেয়েটাও। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর মেয়েটাকে আর কোথাও দেখতে পেলো না সে।

নিজনি-নভগরড। ভলগা আর ওকা নদীর মোহনায় গড়ে উঠেছে এই শহর। ভলগার একটা শাখা শহরটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একটা লম্বা সেতু শহরের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। শহরটা বেশি বড় নয়; লোকসংখ্যা হাজার পঞ্চাশেক হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বছরের এই সময়টায় লোকসংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। দেশ বিদেশের কয়েক লাখ লোক রকমারি জিনিস নিয়ে হাজির হয় এখানকার বিখ্যাত শিল্পমেলায়।

নিজনি-নভগরডের পরেই পার্ম শহর। ট্রেন সেখানে যায় না। ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া যায়, কিন্তু স্টীমারে করে যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধা। এতে সময়ও লাগে কম।

মাইকেল প্রথমেই গেলো স্টীমারঘাটে। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, পরের দিন একটা মাত্র স্টীমার যাবে পার্মের দিকে। সেটা ছাড়বে বেলা বারোটায়।

স্টীমারঘাটের কাজ সেরে একটা মাঝারিগোছের হোটেল খুঁজে বের করলো মাইকেল। হোটেলের নাম "সিটি অব কন্সটান্টিনোপল"।

রাতটা সে এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করলো। খাওয়ার পর্বটা হোটেলের ডাইনিং হলেই সেরে নিলো সে।

খেয়েদেয়ে বাইরে বেরুলো মাইকেল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে, অথচ পথে লোকজনের কমতি নেই। বিচিত্র বেশভূষার লোকজনেরা রাস্তায় চলাচল করছে। যেমন বিচিত্র তাদের পোশাক, ঠিক তেমনি অদ্ভুত তাদের ভাষা—এক বর্ণও বোঝার সাধ্য নেই। মেলা উপলক্ষে শহরের গোটা চেহারাটাই যেন পাল্টে গিয়েছে!

এদিক সেদিক বেশ অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলো মাইকেল। ক্লান্ত শরীর। ঘুমে দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে; কিন্তু তবু হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। মনের মাঝে এখন একটা কথাই বারে বারে ঘুরপাক খাচ্ছে। হ্যাঁ, ট্রেনের ঐ মেয়েটার কথা। মেয়েটা যাচ্ছে ইরকুটস্ক। কিন্তু কেন? কি এমন জরুরী কাজ তার? বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউই এখন আর সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে না। আর যাবেই বা কেন; পথেঘাটে তাতার আর কিরঘিজরা ওঁৎ পেতে রয়েছে। লোকজনকে মওকামতো পেলেই সবকিছু লুটপাট করে নিচ্ছে। যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। তাই সাইবেরিয়ায় যেতে হবে শুনলে সাহসী লোকেরাও এখন ভয়ে আঁতকে ওঠে। মাইকেল যাচ্ছে জারের হুকুমে—অনেকটা বাধ্য হয়ে। কিন্তু এই মেয়েটা যাচ্ছে কার হুকুমে? শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কিংবা সংবাদ বাহক নয়তো?

ঘুরতে ঘুরতে বিরাট একটা মাঠ নজরে পড়লো মাইকেলের; অনেকটা পার্কের মতো। লোকজনের বিশ্রামের জন্যে খানিকটা দূরে দূরে বেশ অনেকগুলো বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সারাদিনের ধকলে মাইকেলও বড্ড ক্লান্ত। তাই এখানেই খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবে বলে

www.boiRboi.blogspot.com

ভাবলো সে। তারপর পরিষ্কার দেখে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লো; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা বুজে এলো তার।

কতক্ষণ এভাবে ঘুমিয়েছিলো, জানে না মাইকেল। হঠাৎ কাঁধে কার যেন বলিষ্ঠ হাতের থাবা এসে পড়লো। চমকে উঠে বসলো সে। চোখ কচলে ভালো করে চেয়ে দেখলো, লম্বা চওড়া একটা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। কাঁধে চাপড় মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্যে ভীষণ বিরক্ত হলো মাইকেল। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা ধন্যবাদও দিতে ইচ্ছে হলো লোকটাকে। লোকটা ঘুম না ভাঙালে সারারাত তাকে মাঠেই পড়ে থাকতে হতো।

মাইকেলকে চুপ করে থাকতে দেখে বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো লোকটা, 'এই যে, এতো রাতে এখানে ক করা হচ্ছে, শুনি?'

'হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম এখানে,' লোকটার গা জ্বালা করা প্রশ্নে একটুও রেগে না গিয়ে উত্তর দিলো মাইকেল।

'বিশ্রাম, তাই না? এতো রাতে বিশ্রামের জন্যে এটা উপযুক্ত জায়গাই বটে। ঝামেলা না করে বলে ফেলো তো, আসল মতলবটা কি?'

'বিশ্বাস করুন,' আরো নরম হলো মাইকেলের গলা, 'কোনো কুমতলব নেই আমার। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম...।'

'বুঝেছি, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। ঠিক আছে; আমার সঙ্গে ওদিকটায় চলো,' বলে একটা গাড়ির দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখালো লোকটা।

মাইকেল দেখলো, খুব কাছেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে—ক্যারাভান। জিপসীদের ঘর সংসার বলতে এই ক্যারাভানকেই বোঝায়। কিন্তু

এখানে এই অসময়ে ক্যারাভান এলো কোত্থেকে ? হঠাৎ মনে পড়ে গেলো তার ; শহরে মেলা হচ্ছে, আর এরা এসেছে সেখানেই। নানারকম যাদুর খেলা আর গণকগিরিতে ওস্তাদ এই জিপসীরা। মেলায় নিশ্চয়ই দল বেঁধে এসেছে এরা। কিন্তু এতো রাতে এই খোলা ময়দানে মাত্র একটা ক্যারাভান কেন ? একটু যেন অবাকই হলো মাইকেল।

মাইকেলের সঙ্গে লোকটার কথা কাটাকাটি শুনে ক্যারাভানের ভেতর থেকে একজন মেয়েলোক বেরিয়ে এলো। জিপসীদের আঞ্চলিক ভাষায় লোকটার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো সে, 'সবকিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি। লোকটা তো সরকারি গোয়েন্দাও হতে পারে। এতো রাতে এসব হুজ্জতি বাদ দিয়ে এবার ভেতরে চলে এসো তো ; তোমার খাবার কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো লোকটা। তারপর বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো, স্যাঙারে। কালই তো এ দেশ ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। তাই আজ কোনো ঝামেলায় না জড়ানোই ভালো।'

স্যাঙারে নামের মেয়েলোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কি। কালই আমাদেরকে চলে যেতে হবে ? কিন্তু মেলা শেষ হতে যে ঢের বাকি।'

'ফাদারের হুকুম ; বিদেশীদের সবাইকে আগামীকালের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে হবে। মেলা পণ্ড হয় হোক।'

মাইকেলকে ছেড়ে দিয়ে ক্যারাভানে গিয়ে ঢুকলো লোকটা। মাইকেলও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কাজের শুরুতেই কারো সঙ্গে কোনো গোলমালে সে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কারণ এতে তার আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ার ভয় রয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা চলে যেতেই মনে মনে ভীষণ হাসি পেলো মাইকেলের। জিপসী দুজন ভেবেছে, ওদের কথা সে কিছুই বুঝতে পারেনি। অথচ পুরোটাই বুঝেছে সে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে জিপসীদের আঞ্চলিক ভাষাটাও রপ্ত হয়েছে তার।

গভীর রাতে হোটেলে ফিরে এলো মাইকেল। এসেই শুয়ে পড়লো বিছানায়। সারাদিনের ধকলের পর নরম বিছানায় লম্বা হয়ে পড়তেই রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হলো দু'চোখের পাতায়।

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলো মাইকেলের। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলো। তারপর হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে রওনা হলো সে।

যে স্টীমারটা পার্ম যাচ্ছে, সেটার নাম ককেসাস। ছাড়তে এখনো ঘণ্টাপাঁচেক বাকি। মাইকেল তবুও তাড়াহুড়ো করে টিকেট কাটলো। দিনকালের অবস্থা খারাপ। বলা তো যায় না, খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে হয়তো শুনবে—সমস্ত টিকেটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। স্টীমার ঘাট থেকে মাইকেল সোজা চলে গেলো মেলা-মাঠে। হাতে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে, অথচ করার কিছু নেই। তাই মেলায় ঘুরে ঘুরেই সময়টা কাটিয়ে দেবে সে।

মেলা বসেছে বিরাট একটা মাঠে। জায়গাটা শহর ছাড়িয়ে সামান্য দূরে। লম্বা একটা ব্রিজ পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। জায়গাটার ধারেকাছে লোক বসতি নেই ; চারদিকে শুধুই ধু ধু মাঠ। অশ্বারোহী কশাক সৈন্যরা ব্রিজে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পদাতিক সৈন্যরাও চুপচাপ বসে নেই। বন্দুক হাতে করে গোটা মেলা-মাঠের ওপর নজর রাখছে তারা। আগে সৈন্যরাও মেলার আমোদ ফুর্তিতে

অংশ নিতো ; কিন্তু এবার তাদের ওপর হুকুম হয়েছে, কেবল ডিউটির সময়টুকু ছাড়া মেলা-মাঠে কেউ যেতে পারবে না। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও দেশ বিদেশের অসংখ্য লোক মেলায় যোগ দিতে এসেছে। লোকজনের চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। আমোদ ফুর্তিরও কমতি নেই। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা বেসুরো ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রকাণ্ড মাঠ। মাঝখান দিয়ে লোক চলাচলের পথ রেখে মাঠের দুই ধারে দোকান বসেছে। লোহার জিনিসপত্র, পশমী জামাকাপড়, সিল্ক, তাঁতে বোনা কাপড়, কাঠের খাট পালঙ্ক, এসবে দোকানগুলো বোঝাই। আরো আছে খাবার-দাবারের দোকান। শুকনো ফলমূল আর নুন মাখানো মাছ মাংসেরও আমদানি হয়েছে প্রচুর। দোকানে দোকানে হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ঝুলছে। বিজ্ঞাপনে জিনিসপত্রের গুণাগুণের কথা ফলাও করে লেখা রয়েছে ; সেই সঙ্গে আরো রয়েছে হাতে আঁকা রকমারি ছবি। লোকজন এসব চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে মজে যাচ্ছে।

কিছু কিছু দোকান সৌখিন জিনিসপত্রে একদম বোঝাই। দামী পাথর, মুক্তো, কাজ করা শাল, গালিচা এসব তো আছেই, আরো রয়েছে নানারকম সৌখিন অস্ত্রশস্ত্র, সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি আর বিভিন্ন দেশ থেকে আনা দামী সুগন্ধী। এছাড়াও আরো অনেক নাম না জানা জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। কি ব্যবহার, তা না জেনেই অনেকে সেগুলো স্রেফ ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে কিনছে।

সারি সারি দোকানপাটের পাশাপাশি অনেকগুলো তাঁবুও খাটানো হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই জিপসীদের। প্রচণ্ড ভিড় এই তাঁবুগুলোয়। জিপসীদের একটা দল সেকস্‌পীয়রের নাটক অভি-

www.boiRboi.blogspot.com

নয় করে দেখাচ্ছে। যদিও অভিনয়ের 'অ' টাও হচ্ছে না, তবুও লোকের ভিড়ে সেখানে ঢোকাই দায়। অন্য একটা তাঁবুতে কয়েকজন জিপসী মেয়েলোক হাত দেখার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। মুশকিল আসানের জন্যে অনেকেই এদের কাছ থেকে তাবিজ-কবচ নিচ্ছে। অন্যান্য তাঁবুগুলোর কোনো কোনোটায় চলছে ম্যাজিক কিংবা সার্কাস।

উট, ঘোড়া, গরু আর অন্যান্য জীবজন্তুও বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়েছে। খাঁচাভর্তি প্রচুর পাখিও দেখা যাচ্ছে। সৌখিন ধনী-দের কেউ কেউ চড়া দামে ঐসমস্ত পাখি কিনে নিচ্ছে। কেউ বাড়িতে পুষবে বলে কিনছে ; আর কেউ কেউ ওগুলোকে কিনেই খাঁচার মুখ খুলে দিচ্ছে। পত্‌ পত্‌ করে পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

জীবজন্তুগুলোকে যে জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে, সেখানে একটা লোক লোহা তাতিয়ে ঘোড়ার গায়ে ছাপ এঁকে দিচ্ছে। গরম লোহার ছ্যাঁকায় ঘোড়াগুলো বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠছে। এসব পেরিয়ে আরো একটু দূরে গান বাজনার আসর বসেছে। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে মেলা-মাঠ সরগরম।

এতো ভিড়ের মধ্যেও সেই পরিচিত সাংবাদিক দুজন, অ্যাল-সাইড জুলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্টকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো। দুজনেই খবর সংগ্রহে ব্যস্ত। মেলার গরম খবরটা কে কার আগে লুফে নেবে, এই নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। প্রথমজন বিভিন্ন দোকানে গিয়ে যেচে পড়ে আলাপ করছে ; অন্যজন শুধু চুপচাপ দেখে যাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে নোট বই খুলে কি যেন সব লিখে নিচ্ছে।

মেলা থেকে একটু দূরে শহরের গভর্নর জেনারেলের অস্থায়ী

একটা অফিস খোলা হয়েছে। বাইরে প্রচার করা হয়েছে, মেলার শৃঙ্খলা রক্ষা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্যেই এই অফিস। কিন্তু সাধারণ লোকজন এ কথা বিশ্বাস করছে না। তাদের ধারণা, এর পেছনে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ রয়েছে। একজন পুলিশ অফিসার ঘন ঘন সেই অফিসে যাচ্ছে আর আসছে। ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। এই অফিস থেকেই মস্কোর সঙ্গে টেলিগ্রামে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

এবার অনেকক্ষণ পরে সেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলো পুলিশ অফিসার। হাতে কয়েক তাড়া কাগজ। সোজা হেঁটে আসছে সে মেলা-মাঠের দিকে। তাকে মেলার দিকে আসতে দেখে লোকজনের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠলো।

মাঠের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা ডায়াস। পুলিশ অফিসার এবার সেই ডায়াসে উঠে দাঁড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লাখ কণ্ঠ যেন বোবা হয়ে গেলো। কারুর মুখ দিয়ে এখন আর টুঁ শব্দটিও বেরুচ্ছে না।

যদিও কোনো প্রয়োজন ছিলো না, তবু "আপনাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি" কথাটা জোরে জোরে তিনবার আউড়ালো পুলিশ অফিসার। তারপর একটা কাগজ বের করে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলো :—

নিজনি-নভগরডের গভর্নরের আদেশ

১। কোনো কারণেই কোনো রাশিয়ান নিজনি-নভগরড ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না।

২। বিদেশীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিজনি-নভগরড ছেড়ে চলে যেতে হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

পাঁচ

পুলিশ অফিসারের ঘোষণার পরপরই দারুণ হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। সাধারণ লোকজনেরা ক্ষেপে গিয়ে নানারকম সরকার বিরোধী কথাবার্তা চিৎকার করে বলতে শুরু করলো। এই ঘোষণায় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকেও জোর প্রতিবাদ উঠলো। কিন্তু সরকারি তরফ থেকে কোনোরকম সহানুভূতি পাওয়া গেলো না। একটু পরেই পুলিশ আর কশাক সৈন্যরা মাঠে ঢুকে পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেললো। তাদের লাঠি আর বন্দুকের গুঁতো খেয়ে সবাই একেবারে চুপ।

কে কার আগে মেলা ছেড়ে পালাবে, এবার তাই নিয়ে শুরু হলো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য জিপসীরাই এগিয়ে; কারণ সঙ্গে ওদের ক্যারাভান রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ীরা পড়েছে ফ্যাসাদে। এতো অল্প সময়ে জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব। তবু যেতে তাদেরকে হবেই। তাই মালপত্রের বেশিরভাগই ফেলে রেখে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি কিংবা অন্য কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করার জন্যে একেকজন পাগলের মতো এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। একটু আগেও লাখ লাখ লোকের চেঁচামেচিতে যে জায়গাটা ছিলো সরগরম, এখন সেটাকে একটা প্রেতপুরী বলে মনে হচ্ছে।

সরকারি তরফ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। মেলা গুটিয়ে নেয়ার ঘোষণা বিনা কারণে দেয়া হয়নি। গোয়েন্দা পুলিশের ধারণা, আইভান ওগারেফ এখনো রাশিয়াতেই রয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, নিজনি-নভগরড কিংবা পার্মের কোনো জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে সে।

রাশিয়া ছেড়ে চলে যাবার সময় প্রত্যেক বিদেশীর ছাড়পত্র ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে। এতে গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে রাশিয়া ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া আইভানের পক্ষে সহজ হবে না। বিদেশীরা চলে গেলেই শুরু হবে খানাতল্লাশী। কাজেই লুকিয়ে থেকে বেশি সুবিধা হবে না আইভানের। ধরা তাকে পড়তেই হবে। —গোয়েন্দা পুলিশের অন্তত এই-ই ধারণা।

এতক্ষণ অবাক হয়ে পুলিশের চোখ রাঙানি আর লোকজনের ছুটোপুটি দেখছিলো মাইকেল। এবারে হঠাৎ খেয়াল হলো—স্টীমার ছাড়বে ঠিক বারোটায়। এখন প্রথমে তাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে তার ছাড়পত্রে সই করিয়ে নিতে হবে। এতে কতক্ষণ লেগে যায় কে জানে। তাই আর দেরি না করে প্রথমে পুলিশ স্টেশনে যাবে বলে ঠিক করলো সে।

পুলিশ স্টেশনের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো মাইকেল। হঠাৎ মনে পড়লো সেই মেয়েটার কথা। যদিও মেয়েটার কাছে সাধারণ একটা অনুমতিপত্র রয়েছে; তবু নতুন ঘোষণার পর তা বাতিল হয়ে যাবার কথা। ইরকুটস্কে আর যাওয়া হচ্ছে না তার। মেয়েটাকে যদি এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় তো মন্দ কি? —মনে মনে ভাবলো সে। ইচ্ছে করলে একজন কিংবা দুজনকে সফরসঙ্গী হিসেবে সে নিতে পারে। ছাড়পত্রে এই ক্ষমতাও তাকে

www.boiRboi.blogspot.com

দেয়া হয়েছে। মেয়েটাকে সঙ্গী হিসেবে নিতে পারলে তারও সুবিধা। এতোটা পথ একলা একলা গেলে অনেকের মনেই খটকা লাগতে পারে। আর এদের মধ্যে শত্রুপক্ষের লোক থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু মেয়েটাকে সঙ্গে নিলে লোকজন সন্দেহ করবে না। কেউ জিজ্ঞেস করলে ভাইবোন বলে চালিয়ে নেয়া যাবে। তাই পুলিশ স্টেশনে না গিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে বেরুলো মাইকেল।

নিজনি নভগরড খুব একটা বড় শহর নয়। গোটা শহরটাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চষে ফেললো মাইকেল। হোটেল, গির্জা, পার্ক, অনাথ আশ্রম—কিছুই বাদ দিলো না সে। কিন্তু মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

বেলা এগারোটার একটু পরে পুলিশ স্টেশনে পৌঁছলো মাইকেল। একটা মাত্র কাউন্টার। আর সেখান থেকেই সমস্ত বিদেশীদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। মাইকেল দেখলো, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লে অনেকক্ষণ লেগে যাবে। স্টীমারে আর যাওয়া হবে না তার। তাই এক ফন্দি আঁটলো সে। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো একজন পুলিশ। তাকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললো; হাতে গুঁজে দিলো দু'টো রুবল। যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো এতে। পুলিশটা তাকে ওয়েটিং রুমে বসতে বলে ভেতরে চলে গেলো।

ওয়েটিং রুমে পা দিয়েই চমকে উঠলো মাইকেল। সেই মেয়েটা! একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে রয়েছে। চোখে মুখে হতাশার ছাপ। মাইকেল ঠিকই আন্দাজ করেছিলো। মেয়েটার অনুমতিপত্র যে বাতিল হয়ে গিয়েছে, তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মাইকেলের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটা। তাকে আশ্বস্ত করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে; কিন্তু এরই মধ্যে পুলিশটা এসে

হাজির। মাইকেলকে একপাশে টেনে নিয়ে কানে কানে কি যেন বললো। তারপর ছাড়পত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলো সে। মাইকেল এবার মেয়েটার কাছে গিয়ে মোলায়েম গলায় বললো, 'এ্যাই, আমিও ইরকুটস্কে যাচ্ছি। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারো তুমি। অনুমতির জন্যে ভেবো না। সেসব ব্যবস্থা করাই আছে।'

নিবু নিবু প্রদীপে খানিকটা তেল ঢাললে সেটা যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে ; মাইকেলের কথায় মেয়েটার চেহারাও ঠিক তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। খুশির চোটে অনেকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। এমন কি মাইকেলকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষাও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। শুধু মাথাটা একটু কাত্ করে মাইকেলের কথায় সম্মতি জানালো সে।

মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে স্টীমার ঘাটের দিকে রওনা দিলো মাইকেল।

স্টীমারের নাম ককেসাস। আর মাত্র কয়েক মিনিট পরেই সেটা পার্মের দিকে রওনা দেবে। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে মাইকেল যখন স্টীমার ঘাটে পৌঁছলো, ঘড়িতে তখন এগারোটা পঞ্চান্ন। তাড়াতাড়ি আগের টিকেটটা বদলে দুটো প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করলো সে। লোকজনেরা খুব তাড়াতাড়ি পুলিশ স্টেশন থেকে ছাড়া পাচ্ছে না। তাই স্টীমারে যতোটা ভিড় হবে বলে মাইকেল ভেবেছিলো, ততোটা হয়নি। আজ সেজন্যেই পাঁচ মিনিট আগে এসেও দুটো কেবিন পাওয়া গেলো।

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক বেলা বারোটায় ভোঁ শব্দ করে ছেড়ে দিলো স্টীমার। জানালা দিয়ে চেয়ে ভলগার ছোট ছোট ঢেউ দেখতে লাগলো মাইকেল। পাশে বসে রয়েছে মেয়েটা। জানালা দিয়ে সেও বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। অথচ মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে মোটেই উৎসাহ দেখাচ্ছে না সে। আর মাইকেলও গায়ে পড়ে কথা বলতে নারাজ। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা এভাবে চুপ মেরে যাওয়াতে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে সে।

এভাবে ঘন্টাদুয়েক কেটে যাবার পর বরফ গললো যেন। হঠাৎ বলে উঠলো মেয়েটা, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আপনি সাহায্য না করলে ইরকুটস্কে আর যাওয়া হতো না আমার।'

'এতে আমারও যে লাভ হয়নি, তা নয়,' বললো মাইকেল, 'নইলে এতোটা পথ একলা একলাই যেতে হতো আমাকে।'

'মাথার ওপর বিপদ জেনেও ইরকুটস্কে যাচ্ছি আমি ; কারণ যেতে আমাকে হবেই,' বললো মেয়েটা, 'যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সেখানে যাচ্ছি, সেটা খুবই জরুরী। কাল সবকিছু খুলে বলবো আপনাকে।'

বলে কি মেয়েটা! —মনে মনে ভাবলো মাইকেল। ইরকুটস্কে কি কাজ তার? সেও কি সরকারি সংবাদ বাহক নাকি শত্রুপক্ষের কেউ? —নানারকম এলোমেলো ভাবনায় পেয়ে বসলো মাইকেলকে। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে মুখে বললো, 'যদি খুবই গোপনীয় কোনো ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে না'ই বা বললে!'

'যতো গোপনীয়ই হোক, আপনাকে বলতে বাধা নেই,' বলে হাই তুললো মেয়েটা। তারপর বললো, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে ; নইলে আজই

সবকিছু খুলে বলতাম আপনাকে।'

'বেশ ; নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ো এবার। আর হ্যাঁ, কি যেন নাম তোমার ?'

লজ্জা পেলো মেয়েটা। নিজের নামটা বলার কথা এতক্ষণ খেয়াল হয়নি তার। মাইকেল জিজ্ঞেস করায় মেয়েটার ফর্সা চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলো সে। তারপর বললো, 'নাদিয়া ; নাদিয়া ফেডর। আপনি আমাকে নাদিয়া বলেই ডাকবেন,' বলে নিজের কেবিনে চলে গেলো মেয়েটা।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের দিকে পা বাড়ালো মাইকেল। বিভিন্ন ধরনের লোকজনের ভিড়ে সেখানে পা ফেলাই মুশকিল। যাত্রীদের কেউ কেউ দল বেঁধে জটলা করছে, বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে কয়েকজন আবার নাক ডাকাচ্ছে। পুঁটলি থেকে খাবার বের করে খাচ্ছে কেউ কেউ। এছাড়া অনেকেই এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

সেকেণ্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাসের মাঝামাঝি খালি জায়গাটায় হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মাইকেল। থার্ড ক্লাস ডেকের জিপসীদের কথাবার্তা কানে এলো তার। একজন পুরুষ আর একজন মেয়েলোকের গলা শোনা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর দুটো এর আগেও কোথায় যেন শুনেছে সে। হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে তার ; পরশু রাতের সেই জিপসী দুজন। যদিও খুব চাপা গলায় ওরা আলাপ করছে ; কিন্তু মাইকেল ঠিক শুনতে পাচ্ছে। পুরুষ লোকটা মেয়েটাকে বললো, 'ঠিক সময়ে জায়গামতো পৌঁছতে পারলে হয় ; তারপর আমাকে আর ঠেকায় কে!'

'কিন্তু এদিকে যে আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে সে-খেয়াল

www.boiRboi.blogspot.com

আছে ?' বললো মেয়েলোকটা, 'মস্কো থেকে একজন রাজদূতকে ইরকুটস্ক পাঠানো হয়েছে। হয়তো এ্যাদ্দিনে সেখানে পৌঁছেও গিয়েছে সে।'

'দূর! রাজদূত মাত্র কদিন আগে রওনা হয়েছে। ইরকুটস্ক পর্যন্ত আর যেতে হচ্ছে না তাকে। এর আগেই সে গায়েব হয়ে যাবে।'

আর দাঁড়ালো না মাইকেল ; সোজা চলে এলো নিজের কেবিনে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। কিন্তু কিছুতেই চোখের পাতা এক হলো না তার। মাথায় কেবল জিপসী দুজনের কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ইরকুটস্কে যে রাজদূত পাঠানো হচ্ছে, দু' চারজন পুলিশ কর্মকর্তা আর সেনাবাহিনীর বাঘা বাঘা কয়েকজন জেনারেল ছাড়া আর কারুরই তা জানার কথা নয়। অথচ এই জিপসী দুজন সে-কথা জেনে ফেলেছে! আরো একটা কথা মনে পড়লো তার। নিজনি-নভগরডের গভর্নর ঘোষণা দেয়ার আগেই ওরা জেনে গিয়েছিলো ; পরের দিন সমস্ত বিদেশীকে রাশিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে জানলো ওরা ? ওরা কি সত্যি সত্যিই জিপসী, নাকি অন্যকিছু ? —ভেবে ভেবে কোনো কূল কিনারা পেলো না মাইকেল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটু পরে ডাইনিং রুমে গিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিলো মাইকেল। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বোধহয়, তাই বেহুঁশের মতো ঘুমোচ্ছে। মাইকেল তাকে আর জাগালো না। নিজে খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। এবারে কিন্তু শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

পরদিন ভোরে কামা পৌঁছলো স্টীমার। সেটা ঘাটে ভিড়তেই পুলিশ আর কশাক সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠলো। যাত্রীদের কারা কারা স্টীমারে উঠছে কিংবা নামছে তা লক্ষ্য রাখাই এদের কাজ।

যাত্রীদের সঙ্গে একদল জিপসীও নামলো। এদেরকে দেখেই চিনতে পারলো মাইকেল; নিজনি-নভগরডের মেলায় এসেছিলো এরা। মেলা পণ্ড হওয়ায় ফিরে যাচ্ছে নিজ দেশে। জিপসীদের এই দলে বিশজন পুরুষ আর পাঁচজন মেয়ে। মেয়ে, পুরুষ সবারই গায়ে বিচিত্র ধরনের চুমকি বসানো পোশাক। রোদের আলোয় চুমকিগুলো ঝিকমিকিয়ে উঠছে। কাল যে দুজনের কথায় আড়ি পেতেছিলো মাইকেল, তারাও এই দলে রয়েছে। মেয়েলোকটার নাম স্যাঙারে; নামটা আগেই জেনে গিয়েছিলো সে। চেহারাটা ভালোই বলতে হবে। তামাটে রং কিন্তু টানা টানা চোখ। শারীরিক গড়নও চমৎকার। দেখতে আর দশটা জিপসী মেয়ের মতো মোটেই রুক্ষ নয়। পুরুষটার চেহারাটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। বিরাট একটা আলখাল্লায় পুরো শরীরটা ঢেকে রয়েছে। মাথার টুপিটা মুখ পর্যন্ত নামানো। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে সে। লোকটার সাজ-পোশাকে একটু খটকা লাগলো মাইকেলের। জিপসীরা সাধারণতঃ লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পথ চলতে ভালবাসে। অথচ এই জিপসীটার চালচলনে মনে হচ্ছে, লোকজনের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সে আড়ালে রাখতে চাইছে। নামতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকালো লোকটা—চোখাচোখি হয়ে গেলো মাইকেলের সঙ্গে। মাইকেল ইচ্ছে করেই চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সেদিনের সেই ভবঘুরে পথচারীই যে মাইকেল, এই জিপসীটা তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। আড়চোখে

www.boiRboi.blogspot.com

একবার চাইলো মাইকেল, একদৃষ্টিতে তার দিকেই চেয়ে রয়েছে লোকটা—চোখেমুখে কেমন যেন সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠেছে।

ছয়

ঠিক এক ঘণ্টা পর স্টীমার ছাড়ার আওয়াজ শোনা গেলো। তখনো পাটাতন তুলে নেয়া হয়নি। এমন সময় একজন লোক প্রচণ্ড শব্দ করে পাটাতনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়েই এই বিপত্তি। কিন্তু মোটেও দমলো না লোকটা, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই একদৌড়ে স্টীমারে উঠে গেলো সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমারের পাটাতন তুলে নেয়া হলো।

ডেকের বেঞ্চিতে বসে হাঁপাতে লাগলো লোকটা। এমন সময় আরো একজন সেখানে এসে হাজির। পরের জনকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো প্রথমজন। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি উধাও। এবারে মুখ খুললো প্রথমজন, 'ব্যাপার কি, মিঃ ব্লাউন্ট? আপনি দেখছি নাছোড়বান্দার মতো আমার পেছনে লেগেই রয়েছেন!'

'আমারও তো সেই একই কথা, মশিয়ে জুলিভেট, আপনি কেন আমার পিছু নিয়েছেন আপনি?'

'ঠিক আছে। আগের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি,' বললো জুলিভেট, 'আমরা কেউ কারো পিছু নিচ্ছি না। আমরা চলছি পাশাপাশি।

হাতে হাত মিলিয়ে। কি, এতে আপত্তি আছে কোনো ?'

'মোটেই না। বরং আগে থেকেই এরকমটা হওয়া উচিত ছিলো। আমরা তো একই পথের পথিক ; তাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে দুজনেরই তো লাভ।'

'কিন্তু তাই বলে আমি যা শুনবো তা কিন্তু আপনাকে বলতে পারবো না,' বললো জুলিভেট।

'বেশ। তাহলে আমিও যা দেখবো তা আপনাকে জানাবো না ; কি, রাজি ?' জানতে চাইলো ব্লাউন্ট।

'একশোবার,' বলে হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো জুলিভেট। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'নতুন খবর কিছু পেলেন, ব্লাউন্ট ?'

'না ; আপনি ?'

'আমি কিছু খবর জেনেছি, সেই খবর টেলিগ্রাম করে পাঠাতে গিয়েই তো এতো বিপত্তি !' বললো জুলিভেট, 'আর একটু হলেই স্টীমার দিয়েছিলো ছেড়ে।'

'খবর ! কি খবর জেনেছেন, শুনি ?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলো ব্লাউন্ট।

'আপনি তো এখন বন্ধু মানুষ ; তাই বলতে কোনো বাধা নেই। ফিওফার খান তাতার বাহিনী নিয়ে সেমিপোলোটিংস্ক পেরিয়ে ইরতিশ নদীর তীরে ঘাঁটি গেড়েছে।'

মনে মনে ভীষণ দমে গেলো ব্লাউন্ট। এমন একটা টাটকা খবর তার হাতছাড়া হয়ে গেলো !

ব্লাউন্টকে দমে যেতে দেখে মনে মনে খুশিই হলো জুলিভেট। কিন্তু মুখে বেজে উঠলো আশ্বাসের সুর। বললো, 'ইচ্ছে করলে খবরটা আপনার পত্রিকায় পাঠাতে পারেন। এতে কোনো আপত্তি

নেই আমার। কারণ আপনি তো এখন আমার বন্ধু।'

মনে মনে জুলিভেটের ওপর চটে গেলো ব্লাউন্ট। এই ভালোমানুষি কথার আড়ালে সে যে তাকে বিদ্রূপ করছে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না। ব্লাউন্ট ভালো করেই জানে, খবরটা তার পত্রিকায় পৌঁছনোর আগেই প্যারিসের সবকয়টা পত্রিকায় তা বেরিয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে নিজের ওপরই মেজাজ খিঁচড়ে গেলো তার। ধপাস করে বসে পড়লো একটা বেঞ্চিতে। রাগে দুঃখে দু'হাত দিয়ে চোখমুখ ঢেকে ফেললো সে। ততক্ষণে সেখান থেকে উধাও হয়েছে জুলিভেট।

বেলা দশটার দিকে ঘুম ভাঙলো নাদিয়ার। একটানা এতক্ষণ ঘুমোনোর পর এখন বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে তাকে। নাদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলো মাইকেল। দুজনের কারুরই কালকের সেই ইতস্তত ভাবটা এখন আর নেই। বেশ খোলা মনে আলাপ করছে দুজন। প্রথমে নাদিয়াই কথা বললো, 'মস্কো থেকে কতদূর এলাম আমরা ?'

'ন'শো *ভার্স্ট,' বললো মাইকেল।

'মোটে !'

'হ্যাঁ। এখনো দু'হাজার ভার্স্ট বাকি।'

অন্য কথায় চলে গেলো নাদিয়া। বললো, 'আমার বাবার নাম ওয়াসিলি ফেডর। রিগার খুব নাম করা ডাক্তার। বছর দেড়েক হলো তিনি নির্বাসনে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে।'

* ১ ভার্স্ট = ১১৬৫ গজ।

www.boiRboi.blogspot.com

'বাড়িতে আর কে কে আছেন তোমার ?'

'এখন আর কেউ নেই। মা মারা গিয়েছে একমাস আগে। কোনো ভাইবোনও নেই আমার,' বলতে বলতে দু'চোখ ছল ছল করে উঠলো নাদিয়ার।

'নির্বাসিতদের সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু সরকারি অনুমতি পত্র লাগে ; সেটা সঙ্গে নিয়েছো তো ?'

'হ্যাঁ। সেসব কাগজপত্র সঙ্গেই আছে। আমার তো আর কেউ নেই। তাই মা মারা যাবার পর সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম ; আমাকে যেন বাবার ওখানে গিয়ে থাকতে দেয়া হয়। তারা এই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।'

'কিন্তু সাইবেরিয়ার মতো জায়গায় গিয়ে থাকতে পারবে তুমি ?'

'আপাততঃ কিছুদিন সেখানে থেকে বাবার হয়ে সরকারের কাছে ক্ষমা চাইবো। ক্ষমা পেলে বাবার সঙ্গে ফিরে যাবো রিগায়। নইলে সাইবেরিয়াতেই থেকে যেতে হবে।'

অবাক হলো মাইকেল। বয়স আর কতোই বা হবে নাদিয়ার, খুব বেশি হলে সতেরো। অথচ কি অসাধারণ মনের জোর। তবু মুখে বললো মাইকেল, 'কিন্তু এতোটা পথ একা একা পাড়ি দিতে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি, নাদিয়া।'

'কিন্তু কর্তব্য যে করতেই হবে। বাবা জীবনে কোনোদিন অন্যায় কিছু করেননি ; অথচ তাঁর কপালেই নির্বাসন জুটলো। বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই শরীর মন ভেঙে পড়ে মায়ের। বাবার শোকে শেষ পর্যন্ত মারাই গেলো মা। মা'র মারা যাবার খবর বাবা কিভাবে যেন জানতে পেরেছেন। এরপর থেকেই আমাকে দেখার জন্যে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। আর তাইতো ছুটে যাচ্ছি

www.boiRboi.blogspot.com

বাবার কাছে। ভালো করে পথঘাট চিনি না। অনেক জায়গার নামও জানি না। কিন্তু তবু যেতে আমাকে হবেই…।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো নাদিয়ার কথা শুনে যাচ্ছে মাইকেল। স্টীমার তখন ভলগার বুক চিরে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন, অর্থাৎ উনিশে জুলাই পার্ম পৌঁছলো ককেসাস।

এখান থেকে যারা সাইবেরিয়ায় যায়, তারা শীতকালে স্লেজ আর গরম কালে ঘোড়ার গাড়ি কেনে। কেউ কেউ সে সমস্ত নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে যায় ; কেউ বা আবার চালক ভাড়া করে। এই সমস্ত গাড়িঘোড়ার জন্যে পার্ম খুবই বিখ্যাত। যে কোনো ধরনের গাড়ি সব সময়েই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্টীমার থেকে নেমে কোথাও কোনো গাড়ি দেখতে পেলো না মাইকেল। ঘটনাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না। নিজনি-নভগরডের সরকারি ঘোষণার পর যে যেভাবে পেরেছে গাড়িঘোড়া কিনে নিজ নিজ দেশের পথে রওনা হয়েছে। দু'চারটা ঘোড়ার গাড়ি যে পাওয়া যাচ্ছে না, তা নয়। তবে দাম অসম্ভব চড়া।

অনেক খুঁজে পেতে একটা গাড়ি জোগাড় করলো মাইকেল। তারানতাস। গাড়িটা তেলগার চাইতে অনেক ভালো। চার চাকার গাড়ি। তেলগাও অবশ্য চার চাকার ; কিন্তু তারানতাসে চড়ে যতোটা আরাম, তেলগায় তার অর্ধেকও নয়। তারানতাসে চেপে বড় বড় গর্ত কিংবা উঁচু-নিচু জায়গা পেরুনোর সময় ঝাঁকুনি লাগে না। কিন্তু তেলগার ঝাঁকুনিতে পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যেতে চায়। নিচে কাঠের পাটাতন থাকায় পথ চলতে গিয়ে কাদা ছিটায় না তারানতাস। মধ্যে মধ্যে তেলগাতে একটা মারাত্মক অসুবিধা দেখা দেয়।

হঠাৎ ঘোড়া আর গাড়ির মধ্যেকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শক্ত দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে গাড়ি পড়ে থাকে একপাশে, আর ঘোড়াগুলো ছুটে যায় অন্যদিকে।

তারানতাস জোগাড়ের পর হৃষ্টপুষ্ট দেখে তিনটে ঘোড়া জোগাড় করলো মাইকেল। ঘোড়াগুলো সাইবেরিয়ার ; সমস্ত শরীর ভালুকের মতো ঘন লোমে ঢাকা। গাড়ি আর ঘোড়ার পরে এবারে ইমস্‌চিক —মানে গাড়োয়ান। পাওয়া গেলো একজনকে। ভাবচক্করে নবাবি চাল, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদে লোকটা দারুণ নোংরা। মাইকেল আর নাদিয়াকে দেখে মন উঠলো না তার। বিড়বিড় করে বললো, 'যতোসব কাকের দল ; ভার্স্ট পিছু ছয় কোপেক করেও জুটবে কিনা সন্দেহ!'

গাড়োয়ানি ভাষায় কাক মানে হাড় কিপটে যাত্রী ; আর দরাজ-দিল যাত্রীরা ঈগল। লোকটার বিড়বিড় করে বলা কথার খানিকটা শুনে ফেলেছিলো মাইকেল। এবারে জবাব দিলো সে, 'আমরা কাক নই, ঈগলের বাবা আমরা! ভার্স্ট পিছু ন'কোপেক, সেই সঙ্গে পাবে মোটা বকশিশ ; চলবে?'

উত্তর না দিয়ে লোকটা উঠে বসলো চালকের আসনে। হাতের চাবুকটা সাঁই সাঁই করে শূন্যে ঘুরালো কয়েকবার। আর দেরি না করে মাইকেলও নাদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লো গাড়িতে। চাবুকের শব্দেই জেনে গিয়েছে সে—নয় কোপেকে রাজি আছে গাড়োয়ান। মাইকেলরা উঠে বসতেই আবার চাবুকের আওয়াজ পাওয়া গেলো। এবার আর বাতাসে নয় ; চাবুক পড়লো ঘোড়াগুলোর পিঠে। জোরের সঙ্গে ছুটে চললো তারানতাস।

কিছুটা পথ পেরুনোর পর ঝড়ের গতিতে ছুটে চললো গাড়ি।

www.boiRboi.blogspot.com

যারা সাইবেরিয়ায় প্রায়ই যাওয়া আসা করে, তারা কেউই তারানতাসের এই পাগলাছুট দেখে আশ্চর্য হয় না। কিন্তু যারা প্রথম সাইবেরিয়ায় আসে, তারানতাসকে এভাবে ছুটতে দেখে তাদের চোখ কপালে উঠে যায়। নানারকম ছোট বড় গর্ত, ঢালু বা উঁচু রাস্তা কিংবা ছোট ছোট ঝোপঝাড় অবলীলায় পার হয়ে যায় এই গাড়ি। মাইকেলদের গাড়িটাও ঠিক এমনিভাবে ছুটে চলেছে।

তেজী ঘোড়া। যাত্রীদের আসনে ঈগলদের বাবা! আর মজবুত গাড়ি পেয়ে ইমস্‌চিককে আর পায় কে! গাড়োয়ানি বুলির তুবড়ি ছুটিয়ে ঘোড়াগুলোকে যেন তাড়িয়ে নিচ্ছে সে।

মাইকেলরা যখন যাত্রা শুরু করেছিলো, আকাশে তখন সূর্য জ্বলজ্বল করছিলো। কিন্তু এতোটা পথ পেরিয়ে আসার পর আবহাওয়াটা এখন আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছে। ঠাণ্ডা বইতে শুরু করেছে। একটু পরে সূর্য ডোবার কথা, কিন্তু কালো মেঘে ঢেকে গেলো সূর্যটা। দূরের আকাশে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বহুবার এ পথ দিয়ে গিয়েছে মাইকেল। সে জানে, এসব কিসের লক্ষণ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময়ে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়তে হবে তাদেরকে। মনে মনে তৈরি হলো সে ; কিন্তু নাদিয়াকে কিছু বললো না। গাড়োয়ানকে আরো জোরে গাড়ি ছোটাতে বললো মাইকেল। গাড়ির গতি গেলো আরো বেড়ে। এবারে বেশ ঝাঁকুনি অনুভব করলো ওরা। এতে নাদিয়ারই কষ্ট হচ্ছে বেশি। কিন্তু করার কিছু নেই। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগুতে হবে।

পোস্টিং হাউস। যাত্রীদের পথ চলতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্যে এই সরকারি ব্যবস্থা। এখানে ঘোড়া, গাড়ি কিংবা গাড়ো-

স্থান বদল করে নেয়ার ব্যবস্থা আছে। যে কেউ পয়সা দিয়ে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। কয়েকটা পোস্টিং হাউস পরপরই ঘোড়াগুলোকে বদলে নিচ্ছে মাইকেল। এতে আরো তাড়াতাড়ি এগুনো যাচ্ছে।

কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়লো কোথাও। চমকে উঠলো নাদিয়া, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিলো নিজেকে। আকাশ জুড়ে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তাও সেই আলোয় যেন ঝল্‌সে উঠছে বার বার। বিদ্যুতের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলো মাইকেল, রাস্তার ধুলোবালিতে অন্য একটা গাড়ির চাকার ছাপ। ইমস্‌চিককে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো—গাড়িটা একটা তেলগা।

রাত বাড়ছে। একটু একটু করে ঝড়ের পূর্বাভাসও প্রকট হচ্ছে। কিন্তু মাইকেল জানে, সত্যিকারের ঝড় শুরু হতে এখনো অনেক বাকি। সাইবেরিয়ার এদিকটায় আবহাওয়ার ধরনটাই এরকম।

২০ জুলাই ভোরবেলা। উরাল পর্বতের চূড়ো নজরে পড়লো মাইকেলের। দেখে মনে হয়, আর একটু এগুলেই পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে গাড়ি। কিন্তু মাইকেল ভালো করেই জানে, উরালের কাছাকাছি পৌঁছতে হলে এখনো অনেকটা পথ পেরুতে হবে। যতো জোরেই গাড়ি চলুক না কেন, সন্ধ্যার আগে কিছুতেই সেখানে পৌঁছনো যাবে না। শুরু থেকেই তাড়াতাড়ি পথ পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে লক্ষ্য ছিলো তার। তাই গাড়োয়ানকে সে বললো, 'যদি কাল ভোরের মধ্যে একটারেনবার্গ পৌঁছতে পারো, তাহলে তিনগুণ বেশি বকশিশ পাবে···তিনগুণ!'

সপাং করে চাবুক পড়লো ঘোড়াগুলোর পিঠে। মাইকেলের কথায় উৎসাহ পেয়ে আরো জোরে গাড়ি ছোটালো ইমস্‌চিক।

www.boiRboi.blogspot.com

উরাল পর্বত আর ডিঙোনো গেলো না। এর আগেই অন্ধকারে ছেয়ে গেলো চারদিক। মাত্র সন্ধ্যা; কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারের জন্যে হাত দশেক দূরের জিনিসও ভালো করে দেখা যায় না। বাতাসের বেগ বাড়ছে, বাড়ছে বিদ্যুতের চমকানিও। মাইকেল ভালো করেই জানে—আর মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হবে। তবু গাড়োয়ানকে গাড়ি চালিয়েই যেতে বললো সে। কোনোমতেই সময় নষ্ট করতে চায় না মাইকেল। এছাড়া এরকম দুর্যোগময় আবহাওয়ায় গাড়ি ছোটানোর পেছনে আরো একটা কারণ রয়েছে। তেলগায় চেপে এই পথ দিয়ে কারা গিয়েছে তা জানা দরকার। যদি শত্রুপক্ষের লোক হয় তাহলে মোকাবিলার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

অন্ধকারে গর্ত কিংবা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে না। তাই রাতের বেলায় গাড়ি চালানো এমনিতেই বিপজ্জনক। তার ওপরে আবার ঝড় শুরু হলে তো কথাই নেই। ঘোড়াশুদ্ধ কোথায় গিয়ে যে ছিটকে পড়বে কে জানে! এরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে মাইকেলদের গাড়ি। বাতাসের ঝাপটায় কাত হয়ে পড়ে যেতে যেতেও আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মধ্যে চাকা গর্তের ওপর পড়তেই লাফিয়ে উঠছে গাড়ি।

রাত এগারোটার দিকে উরালের একেবারে গায়ে গিয়ে পৌঁছলো মাইকেলদের গাড়ি। এবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপরের দিকে ওদেরকে উঠতে হবে। এবড়োখেবড়ো রাস্তা; তবুও একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে তারানতাস। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলো মাইকেল, 'বারোটার মধ্যে কি পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছনো যাবে?'

'মাথা খারাপ!' ইমস্‌চিকের কণ্ঠে ঝাঁজ, 'দেখছেন না, আবহাওয়ার কি অবস্থা? রাত দুটোর মধ্যেও পৌঁছনো যাবে কিনা

সন্দেহ।'

'তুমি চাইলে ঠিকই পৌঁছনো যাবে। উরালের ঝড়ও ওস্তাদ গাড়োয়ানকে ভয় পায়।'

তোষামোদে কাজ হলো। মাইকেলের কথার পরপরই গাড়ির গতি গেলো বেড়ে। ইমস্‌চিকের মুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো মুখ-রোচক সব গাড়োয়ানি বুলি।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে শুরু হলো ঝড়। উরালের ঝড়ের কথা আগে থেকেই জানতো মাইকেল। তবু ঝড়ের এই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে সে-ও খানিকটা ঘাবড়ে গেলো। কড় কড় শব্দে বাজ পড়ছে তো পড়ছেই; কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। বিদ্যুতের আলোয় থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে উরালের চূড়ো। মট্‌ মট্‌ করে একেকটা গাছ উপর থেকে নিচে ভেঙে পড়ছে। হঠাৎ একটা পাইন গাছ কোত্থেকে যেন উড়ে এসে ওদের গাড়ির কাছে আছড়ে পড়লো। তারপর সেটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লো বহু নিচের একটা খাদে। ঘোড়াগুলো এতক্ষণ শান্তই ছিলো। কিন্তু গাছটা এভাবে ভেঙে পড়ায় সেগুলোও ভয় পেয়ে গেলো। সামনে আর এগুতে চাইছে না ঘোড়াগুলো।

ঝড়ের দাপটে সামনে আর এগুচ্ছে না গাড়ি। উপায় না দেখে রাস্তার একপাশে গাড়ি থামালো ইমস্‌চিক। ঘোড়াগুলো এখন রীতিমতো ছটফট করছে; পারলে যেন লাগাম ছিঁড়ে ভাগে আর কি। দক্ষ হাতে ঘোড়াগুলোকে সামাল দিতে লেগে গেলো গাড়োয়ান। এদিকে গাড়ির ভেতরে ছইয়ের পর্দা খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে মাইকেল। এতে বাতাসের ঝাপটা অনেক কম লাগছে ওদের। মাইকেল নাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভয় লাগছে, নাদিয়া?'

'না; ভয় কিসের! এরকম ঝড় আমি আগেও দেখেছি।'

'তবু তৈরি থেকো; একটু পরেই বাতাসের বেগ আরো বেড়ে যাবে। আমাদের গাড়িটাও হয়তো উল্টে যেতে পারে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাতাসের গতিবেগ কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। বাড়লো বিদ্যুতের চমকানি আর বাজ পড়ার কড়্‌ কড়্‌ শব্দ। হঠাৎ গাড়ির একেবারে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লো। সেই শব্দে ঘোড়াগুলো এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো যে আর একটু হলেই গাড়িটা উল্টে পড়তো। গাড়োয়ান সাধ্যমতো চেষ্টা করেও ঘোড়াগুলোকে বাগে আনতে পারছে না। বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নামলো মাইকেল। দু'হাত দিয়ে একটা ঘোড়ার লাগাম কষে ধরলো সে। গাড়োয়ানও একইভাবে অন্য আরেকটাকে বশ করলো। দুটোকে এইভাবে সামাল দেয়ায় তিন নম্বর ঘোড়াটা আপনা থেকেই চুপ মেরে গেলো। এমন সময় বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় ঘোড়াশুদ্ধ রাস্তার একপাশে ছিট্‌কে পড়লো গাড়িটা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে; আর একটু হলেই নিচের খাদে গিয়ে পড়তো ওদের গাড়ি। এতোকিছুর মধ্যেও নাদিয়া কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। মাইকেল ডাক দিতেই গাড়ি থেকে হাসিমুখে নেমে এলো সে। বাতাসের বেগ যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে গাড়িতে বসে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। তিনজন তিনটে ঘোড়ার লাগাম কষে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

অনেকক্ষণ পর ঝড় কিছুটা কমলো। গাড়ি ছাড়ার হুকুম দিলো মাইকেল। কিন্তু এই আবহাওয়ায় গাড়ি ছাড়তে গাড়োয়ান রাজি হলো না। এবারে কড়া সুরে বললো মাইকেল, 'শিগগির গাড়ি ছাড়ো বলছি; নইলে কপালে খারাবি আছে তোমার।'

www.boiRboi.blogspot.com

ধমকে কাজ হলো। তবুও মিনমিন করে সে বললো, 'কিন্তু ঘোড়াগুলো তো এগুতে চাইছে না।'

'এগুতে না চাইলে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলো।'

'তাহলে আমরাই পড়বো বিপদে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন; ঝড় কিন্তু আবার আসবে।'

'ঝড় আসে আসুক। তবুও যেতে আমাদের হবেই—ফাদারের হুকুম।'

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো এই কথায়। ফাদার মানে জার। জারের হুকুমে মাইকেলকে যেতে হচ্ছে শুনে আর কথা বাড়ালো না ইমস্‌চিক। সুড় সুড় করে নিজের আসনে উঠে বসলো সে। চাবুকের সাঁই সাঁই শব্দে ঘোড়াগুলোও নড়েচড়ে উঠলো।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। গাড়োয়ানের টানা হ্যাঁচড়ায় গাড়ি যতটুকু এগোয়, দমকা বাতাসের ধাক্কায় তার অর্ধেকটাই পিছিয়ে আসে। হঠাৎ আকাশ আলো করে আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। সেই আলোয় ওরা দেখতে পেলো, বিরাট একটা পাথরের চাঁই অনেক উপর থেকে গড়াতে গড়াতে গাড়িটার দিকেই যেন ছুটে আসছে। ইমস্‌চিককে গাড়ি থামাতে বলে চোখের পলকে নেমে পড়লো ওরা। ভয়ে চিঁহি চিঁহি শব্দে ঘোড়াগুলো ডেকে উঠলো। গাড়োয়ান বহু চেষ্টা করেও গাড়িটা একপাশে সরিয়ে নিতে পারছে না। এদিকে পাথরটা গড়াতে গড়াতে গাড়ির একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া করার আর কিছুই রইলো না মাইকেলের। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়িটাকে ছাতু করে দেবে ঐ পাথরটা।

হঠাৎ বাঁক নিলো পাথরটা। গাড়ির গা ঘেঁষে সেটা নিচের

www.boiRboi.blogspot.com

খাদে গিয়ে পড়লো; প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনতে পেলো ওরা। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও ঘেমে উঠলো সবাই। নেহাত কপালের জোর, নইলে গাড়ির পাঁচ সাত গজের মধ্যে এসে কেনই বা ঘুরে যাবে পাথরটা। —মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো মাইকেল। এতক্ষণ চুপ করে ছিলো সবাই। এবারে কথা বলে উঠলো নাদিয়া, 'ভয় কি! ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। যারা ন্যায় পথে চলে, ঈশ্বরের অভিশাপ তাদের ওপর বর্তায় না।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়,' বললো মাইকেল। তারপর ইমস্‌চিককে গাড়ি ছাড়তে হুকুম করলো।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। তাড়াতাড়ি সামনে এগুনোর জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা চালাচ্ছে গাড়োয়ান। কিন্তু ঘোড়াগুলোকে কিছুতেই দাবড়ে নেয়া যাচ্ছে না। দমকা বাতাসের ধাক্কায় ওগুলোর চলার গতিও গিয়েছে থেমে। ঘোড়াগুলো ছ'পা এগুলে পিছোয় এক পা। তবুও গাড়োয়ানের চাবুক বাধ্য করছে ওগুলোকে সামনের দিকে এগুতে।

এতোক্ষণ ছিলো শুধু দমকা বাতাস। এবারে শুরু হলো ঘূর্ণিঝড়। কয়েক ঘণ্টা আগের ঝড়কেও হার মানিয়ে দিলো এবারের ঝড়। চারদিক থেকে কেবলই শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরের ছোট বড় গাছপালাগুলো কোন এক যাদুমন্ত্রের বলে যেন শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো বাচ্চাদের খেলার বলের মতো এদিক সেদিক ছুটে যাচ্ছে। এসবের মধ্যেও মাইকেলদের গাড়িটা আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলো। একটা গুহার মতো খাঁজ দেখতে পেলো ওরা। ঘূর্ণিঝড় একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছে; তাই গাড়িটা একপাশে দাঁড় করিয়ে সবাই গিয়ে আশ্রয় নিলো খাঁজে।

ভাগ্যিস ঘূর্ণিঝড় ওদের ওপর দিয়ে যাবার আগেই নিরাপদ একটা আশ্রয় মিলেছিলো ; নইলে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলতো কে জানে !

হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় থেমে গেলো ; কিন্তু শুরু হলো বিদ্যুতের চমকানি আর বাজ পড়ার কড় কড় শব্দ। একটু পরেই নামলো মুষলধারায় বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় পাহাড়ি বৃষ্টি। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। সেই সঙ্গে নামে পাহাড়িয়া ঢল। চলার পথে যা কিছু পায়, ধুয়ে মুছে সব সাফ করে দেয়। মাইকেল অবশ্য ভয় পেলো না ; কারণ পানির স্রোতটা গুহার দিকে আসছে না, সোজা রাস্তা ধরে সেটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়া ছাড়া উপায় নেই,' বললো মাইকেল।

'ভোরবেলায় রওনা দিলে হয় না ?' নাদিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে খামোকা আরো খানিকটা সময় নষ্ট হবে।'

'কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা যেরকম তাতে এই রাত দুপুরে আবার যাত্রা করা কি ঠিক হবে ?'

'কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি ? ঝড়-বৃষ্টির অজুহাতে দায়িত্বে অবহেলা করা মোটেই উচিত হবে না।'

দায়িত্ব ! কিসের দায়িত্ব পালন করতে চলেছে লোকটা ? —মনে মনে ভাবলো নাদিয়া।

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়ির একেবারে কাছে বাজ পড়লো। ইমস্‌চিক বোধহয় বেখেয়ালে ছিলো ; আচমকা শব্দে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লো সে। নাদিয়া যাতে ভয় না পায় তাই ওর একটা

হাত শক্ত করে চেপে ধরলো মাইকেল। খুব কাছ থেকে পোড়া গাছপালার গন্ধ ভেসে আসছে।

বাজের শব্দ মিলিয়ে যাবার কয়েক সেকেণ্ড পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইমস্‌চিক। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগে এই লোকটাই কানে আঙুল দিয়ে মড়ার মতো পড়ে ছিলো মাটিতে। এবারে ঘোড়াগুলোকে ঠিকমতো গাড়ির সঙ্গে জুড়তে লেগে গেলো সে। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এলো মানুষের কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট। নাদিয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো মাইকেল, 'মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। শত্রু হতে পারে কিংবা পথহারা পথিকও হতে পারে। সামনে এগুতে গিয়ে এখন থেকে খুব সতর্ক হতে হবে আমাদের।'

লোকগুলো কারা তা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠলো মাইকেল। নাদিয়ারও খুব ইচ্ছে, মাইকেল যেন লোকগুলোকে খুঁজে বের করে। বলা তো যায় না ; পথ হারানো পথিকও হতে পারে। মাইকেলকে উদ্দেশ্য করে নাদিয়া বললো, 'ওরা নিশ্চয়ই পথহারা পথিক। বিপদে পড়েছে। তাই সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে।'

'করুক ; আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দিয়ে কথা,' ঝাঁজের সঙ্গে বললো ইমস্‌চিক, 'কে বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছে, নাকি আনন্দে গান গাইছে তা দেখার সময় আমাদের হাতে নেই।'

'সময় আছে কি নেই তা আমি বুঝবো,' গর্জে উঠলো মাইকেল, 'আমি যাচ্ছি লোকগুলোর খোঁজ করতে। ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি,' তারপর নাদিয়ার কানে কানে বললো, 'ইমস্‌চিক ব্যাটার মেজাজ চড়ে আছে। একলা রেখে গেলে গাড়ি-

www.boiRboi.blogspot.com

সুদ্ধ ভেগে যেতে পারে। তাই তুমিও এখানে দাঁড়িয়ে থেকো।'

মাইকেল চলে যেতেই কথা ফুটলো ইমস্‌চিকের মুখে, 'ভদ্রলোক কিন্তু মারাত্মক ভুল করলেন। অচেনা জায়গায় লোকজনের ডাক শুনে কখনোই থামতে নেই। ওরা ডাকাত দলের লোকজন হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।'

'ভুল না ছাই!' ভেংচে উঠলো নাদিয়া, 'এরকম করুণ ডাক শুনেও যারা সাড়া না দিয়ে পালিয়ে যায়, তারা শুধু কাপুরুষই নয়; পশুর চাইতেও জঘন্য।'

বাপ্‌রে! মেয়েটা যে দেখছি পুরুষটার চাইতেও কয়েকগুণে বাড়া।—মনে মনে বললো ইমস্‌চিক।

দমকা বাতাসের গজরানি তখনো একেবারে থেমে যায়নি। এরই মধ্যে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে মাইকেল। বেশি দূর যেতে হলো না। গজ পঞ্চাশেক দূরে আধখানা তেলগা নজরে পড়লো ওর। তেলগার পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে লোক দুজনের চেহারা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো মাইকেল। তেলগার কাছাকাছি পৌঁছে টের পেলো, দুজন লোকই বিদেশী। তেলগার বাকি আধখানা নিয়ে গাড়োয়ান হাওয়া হয়ে যাওয়ায় রেগে আগুন হয়ে আছে ওরা। গাড়োয়ানের ব্যাপারেই নানারকম গরম গরম কথা হচ্ছে ওদের মাঝে। আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো সে। একজন আরেকজনকে বলছে, 'এবার আমি ঘড়ি দেখতে শুরু করলাম। যদি ঘন্টাখানেকের মধ্যে ব্যাটা ফিরে না আসে তাহলে আদালতে মামলা ঠুকবো।'

'মামলা-টামলা পরে। শয়তানটাকে আগে হাতের মুঠোয় পেয়ে নিই; চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে নেবো,' বললো দ্বিতীয়জন।

www.boiRboi.blogspot.com

চোখ কপালে উঠলো মাইকেলের। লোক দুজন বলে কি! রাত দুপুরে এক অচেনা জায়গায় গাড়ি ভেঙে পড়ে রয়েছে। এখন কি করে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সট্‌কে পড়বে, সে-খেয়াল নেই। অথচ মুখে কথার খৈ ফুটছে। কথা বলার ভঙ্গি শুনে বোঝা গেলো, দুজনের একজন ফ্রেঞ্চ, অন্যজন বৃটিশ।

'কিন্তু ব্যাটাকে পাচ্ছি কোথায় আমরা? খোঁজ নিলে জানা যাবে এতক্ষণে অন্য গাড়ি চালাতে লেগে গেছে সে,' ফ্রেঞ্চ লোকটা মন্তব্য করলো।

'ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি,' বললো ইংরেজ ভদ্রলোক, 'দুজনের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো কি করে লোকটা?'

'ঘোড়াসুদ্ধ ব্যাটা খাদে গিয়ে পড়লো কিনা কে জানে!'

'তাহলে উচিত সাজা হবে শয়তানটার। কিন্তু ভেগে গিয়ে থাকলে ধরা তাকে পড়তেই হবে। রাশিয়াতে ঘোড়া চুরির শাস্তি বড় ভয়ানক; ধরা পড়ার সাথে সাথে ব্যাটা লটকে যাবে ফাঁসিতে।'

'লোকটা আগে ধরা পড়ুক, তারপর দেখা যাবে। এখন এ অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেটাই ভেবে বের করা দরকার।'

যাক, শেষ পর্যন্ত একজনের মাথায় আসল সমস্যাটা ঢুকেছে। —মনে মনে বললো মাইকেল। ঠিক এমন সময় কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়লো। বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠলো চারদিক। সেই আলোয় মাইকেলকে দেখতে পেলো ওদের একজন। 'ঐ যে; ব্যাটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে,' বলেই মাইকেলের দিকে তেড়ে এলো ইংরেজটা। কাছে এসে ভুল ভাঙলো তার; থতমত খেয়ে গেলো সে। আমতা আমতা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়ে, মানে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'কিন্তু আপনাদের দুজনকে আমি চিনি,' বললো মাইকেল, 'ককেসাস স্টীমারে আপনাদের দেখেছিলাম।'

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সাথে সাথে কড় কড় শব্দে বাজ পড়লো কোথাও। ততক্ষণে ফ্রেঞ্চ লোকটাও তার সঙ্গীর সাথে এসে জুটেছে। মাইকেলকে দেখে চিনতে পারলো সে, 'আরে! আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ককেসাস স্টীমারে দেখা হয়েছিলো আমাদের,' বললো মাইকেল। 'আমার নাম নিকোলাস কোর্পানফ।'

'আমি অ্যালসাইড জুলিভেট; পেশায় সাংবাদিক। আর সঙ্গে যাকে দেখছেন তিনি আমার প্রাণের শত্রু, খুড়ি বন্ধু মিঃ হ্যারি ব্লাউন্ট। পৃথিবীর সেরা পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে দুজনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো মাইকেল। তারপর বললো, 'আমি ইরকুটস্কে থাকি। পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করেও ছুটতে হচ্ছে আমাকে।'

'এদিকে আমাদের হয়েছে এক বিপদ,' বললো জুলিভেট, 'মাঝপথে এভাবে ফেলে রেখে দিয়ে অর্ধেক গাড়ি আর ঘোড়াসুদ্ধ গাড়োয়ান ব্যাটা গায়েব। এখন বলুন তো কি করি?'

'এক কাজ করুন। আমার তারানতাসের তিনটে ঘোড়ার একটা আপনাদের তেলগায় জুড়ে দিন; তাহলে কাল সকালেই একটারেনবার্গ পৌঁছে যেতে পারবেন।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ…।'

হ্যারি ব্লাউন্টকে পুরো কথাটা শেষ করতে দিলো না জুলিভেট। বললো, 'ঘোড়া ছাড়াই যাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এতে মিঃ ব্লাউন্টের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবেই।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিভাবে, শুনি?' জিজ্ঞেস করলো মাইকেল।

'মিঃ ব্লাউন্টকে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলেই তো সব সমস্যা যায়,' বললো জুলিভেট, 'কলমে তার যেমন জোর, গায়ে গতরেও ঠিক তেমনি,' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো।

চোখমুখ লাল হয়ে গেলো ব্লাউন্টের। বললো, 'রসিকতা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু তা যেন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে না যায়।'

'আহ্-হা, এতে চটার কি হলো! কিছুদূর গিয়ে আপনি চলে আসবেন আমার জায়গায়, আর আমি যাবো আপনার জায়গায়। অবশ্য দু'চারটে চাবুকের বাড়ি বাড়তি পাওনা হিসেবে আমার পিঠে পড়বে, এ-কথা হলফ করে বলতে পারি।'

রাগ তবুও কমলো না ব্লাউন্টের। জুলিভেটের ইয়াকি-মস্করার একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলো সে; কিন্তু তার আগেই মাইকেল বলে উঠলো, 'যা হবার হয়েছে। এ-নিয়ে আপসোস করে কোনো ফায়দা হবে না।'

'বলছেন কি মশাই, ফায়দা হবে না? একশোবার হবে,' আবারো ইয়াকি চালে বলতে শুরু করলো জুলিভেট, 'ব্যাটাকে এমন শিক্ষা দেবো যে ভুলেও কোনো বিদেশীকে ধাপ্পা দেবে না।'

'গাড়োয়ানকে মিছেই কেন দোষ দিচ্ছেন? তেলগায় প্রায়ই এরকমটা হয়,' বললো মাইকেল, 'ঘোড়া আর চালকের আসন থাকে একদিকে। মোটা দড়ি দিয়ে চালকের আসনের সঙ্গে যাত্রীর আসন জুড়ে দেয়া হয়। দড়ি পচে বা পুরনো হয়ে গেলে চলতি অবস্থাতেই কখনো পটাশ করে ছিঁড়ে যায়। গাড়োয়ান মোটেও টের পায় না, কারণ চালকের পেছন দিকে থাকে কাঠের একটা পাটাতন। পেছন

ফিরে চাইলেও যাত্রীদের সে দেখতে পায় না।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গোটা ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেলো। না জেনেশুনে বেচারা গাড়োয়ানের নামে এতোসব গালমন্দ করা উচিত হয়নি আমাদের,' বললো ব্লাউন্ট।

'যাক গে সেসব। এবারে চলুন, আমার তারানতাস থেকে আপনাদের একটা ঘোড়া দেয়ার ব্যবস্থা করি।'

হাঁটতে হাঁটতে টুকরো-টাকরা কথা হচ্ছিলো ওদের মধ্যে। একসময় জুলিভেট বললো, 'কপাল ভালো হলে আবার আপনার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে আমাদের। আমরা দুজন যাচ্ছি সাইবেরিয়ায়, মানে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। বুঝলেন না! সাইবেরিয়া তো এখন কেবল ধিকি ধিকি জ্বলছে। সেই আগুন যে কোনো মুহূর্তে গোটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

বাইরে থেকে ক্লাউনের মতো মনে হলেও লোকটা চালাকের একশেষ। খুব কায়দা করে ওর মুখ দিয়ে যুদ্ধের খবরাখবর বের করে নিতে চাইছে! —মনে মনে ভাবলো মাইকেল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে নিরীহ গোবেচারার মতো বললো, 'আমি ওমস্কের দিকে যাচ্ছি; কিন্তু আপনারা সাইবেরিয়ার ঠিক কোন্ জায়গায় যাচ্ছেন?'

'কোন্ জায়গায় আবার! যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, আমরা সেখানেই যাচ্ছি,' বললো জুলিভেট।

'এতো জায়গা থাকতে যুদ্ধের এলাকায় কেন, যদি গুলিটুলি এসে লাগে?' আরো গোবেচারা সাজার চেষ্টা করলো মাইকেল।

'বা রে! আমাদের চাকরিই তো খবর জোগাড় করা; গুলির ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি আবার এর উল্টোটা। গুলিগোলার

www.boiRboi.blogspot.com

আওয়াজ শুনলে ভয়ে আত্মা কেঁপে ওঠে আমার।'

'তো এক কাজ করুন না! আমরা প্রথমে যাবো ইচিম; সেখানে পৌঁছে ভাবচক্কর বুঝে সামনের দিকে এগুবো। ইচ্ছে করলে ইচিম পর্যন্ত আমাদের সাথেই যেতে পারেন আপনি।'

জুলিভেটের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে অন্য কথায় চলে গেলো মাইকেল। গবেট মার্কা চেহারা করে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তাতারদের শেষ খবর কিছু জানেন?'

'খুউব; ফিওফার খানের নেতৃত্বে সেমিপোলাটিংক্স্ কব্জা করে তারা এবার ইরতিশের দিকে এগুচ্ছে।'

'এই খবর তো অনেক আগেই বাসি হয়ে গেছে,' জুলিভেটের একচেটিয়া মাতব্বরিটা পছন্দ হচ্ছিলো না ব্লাউন্টের; তাই অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুললো সে, 'নতুন খবর হলো, আইভান ওগারেফ ছদ্মবেশে সীমান্ত পেরিয়ে গেছে।'

'এবং সেটা ছিলো জিপসীর ছদ্মবেশ,' ফোড়ন কাটলো জুলিভেট।

দমে গেলো ব্লাউন্ট। এই ফরাসী সাংবাদিকের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না সে। ওদিকে মাইকেল তখন ভাবছে অন্য কথা—জিপসীর ছদ্মবেশ! স্টীমারের আলখাল্লা মোড়া সেই জিপসীটা নয় তো?

হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে আর পৌঁছনো হলো না ওদের। হঠাৎ পিস্তলের শব্দ শোনা গেলো। আওয়াজটা মাইকেলের গাড়ির কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে এসেছে। দৌড়ে গেলো সবাই। গিয়ে যা দেখলো, তাতে সবারই আক্কেলগুড়ুম! ওদের গাড়ি থেকে সামান্য দূরে প্রকাণ্ড একটা ভালুক মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে—বোঝা যাচ্ছে,

জন্তুটা মরেনি। পাশেই নাদিয়া দাঁড়িয়ে, হাতে পিস্তল। ওদিকে ইমস্‌চিক দৌড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পেছন পেছন। নাদিয়ার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনলো মাইকেল। ও চলে যাবার কিছুক্ষণ পর পাইনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিলো ভালুকটা। ভালুকটাকে দেখতে পেয়ে দুটো ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে ভাগে। তৃতীয় ঘোড়াটার দিকে ভালুকটা তেড়ে আসতেই পিস্তল ছোঁড়ে নাদিয়া। রক্ষা যে, পিস্তলটা আগেই গাড়িতে রেখে গিয়েছিলো মাইকেল, নইলে এতক্ষণে সবাইকে সাবড়ে ফেলতো জন্তুটা।

ভালুকটা কেবলই কাতরাচ্ছে। আবার গুলি করতে গিয়েও পিস্তল নামিয়ে নিলো নাদিয়া। জন্তুটা যদি আপনাআপনিই মরে যায়, তো কি দরকার ওটাকে আবার গুলি করে?

হঠাৎ দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো জন্তুটা। চোখের পলকে লাফিয়ে পড়লো নাদিয়ার ওপর। একটু বুঝি বেখেয়াল হয়ে পড়েছিলো সে। ভেবেছিলো, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়বে ভালুকটা। তাই সতর্ক হবার সময় পেলো না; ভালুকটার থাবায় মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো নাদিয়া। ভালুকটাও এবার বাগে পেয়েছে ওকে। ওর গায়ের ওপর চেপে বসলো জন্তুটা। ভালুকটা যেই আবার থাবা তুলতে যাবে, অমনি দৌড়ে এলো মাইকেল—জামার নিচে লুকোনো ইয়াতাঘান এখন ওর হাতে। কেউ কিছু বোঝার আগেই চোখের পলকে ভালুকের পেটটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেলো। নাদিয়ার শরীরের ওপর থেকে একপাশে গড়িয়ে পড়লো জন্তুটা। উঠে দাঁড়ালো নাদিয়া।

'সাবাস,' চেঁচিয়ে উঠলো জুলিভেট, 'যেভাবে ভালুকটার ভুঁড়ি ফাঁসালেন তাতে পাকা শিকারীরাও হার মেনে যাবে।'

www.boiRboi.blogspot.com

'ও কিছু না। ছেলেবেলা থেকেই সাইবেরিয়ার বনে-জঙ্গলে মানুষ। জন্তু জানোয়ারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সেখানকার লোকজনদের একটু আধটু এসব জানতেই হয়।'

মাইকেলের উত্তরটা ওদের কারুরই মনে ধরলো না; ধরার কথাও নয়। একটু আগেই সে বলেছিলো, গোলাগুলিকে নাকি ভীষণ ভয় তার। অথচ ভালুকটার পেট ফাঁসানোর সময় ভয়ডরের চিহ্নমাত্রও দেখা গেলো না। তাই জুলিভেট আর ব্লাউন্ট মাইকেলের কথাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সে ব্যবসায়ী, নাকি অন্য কিছু? মনের ভাব গোপন করে নাদিয়ার কাছে এসে দাঁড়ালো জুলিভেট। মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বললো, 'আপনিও কিন্তু কোনো অংশে কম নন,' তারপর মাইকেলের দিকে ফিরে বললো, 'যেমন আপনি, তেমনি আপনার স্ত্রী।'

জুলিভেটের কথায় লজ্জা পেলো নাদিয়া। ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মাইকেল, 'না না, ও আমার দূর সম্পর্কের বোন। পার্মে বাড়ি। ওর বাবা সাইবেরিয়ায় কাজ করে। বাবার কাছে ওকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই চেপেছে।'

ঘোড়াগুলোকে খুঁজে পাওয়া গেলো। বেশিদূর ভাগতে পারেনি; তার আগেই ওগুলোকে ধরে ফেলেছে ইমস্‌চিক। সব ক'টাকে একসঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে এলো সে। একটা ঘোড়াকে তেলগার সাথে জুড়ে দিতে বললো মাইকেল। এই কথায় ইমস্‌চিক খুব একটা খুশি হলো বলে মনে হলো না। বললো, 'কিন্তু এখন তো দুটো গাড়ি হয়ে গেলো, অন্যটা চালাবে কে?'

মাইকেল কিছু বলার আগেই জুলিভেট বলে উঠলো, 'দুটো

গাড়িই চলবে পাশাপাশি ; তুমি শুধু একবার এদিক, একবার ওদিক তাকাবে আর দরকারমতো চাবুক কষবে।'

'কিন্তু···।'

'কোনো কিন্তু নয় ; যে ভাড়ায় তোমাকে এঁরা সাথে নিয়েছেন, আমরাও সেই একই ভাড়া দেবো। কি, খুশি ?'

রাশিয়ার গাড়োয়ানরা ব্যাজার হলে বক্‌বক্‌ করে বেশি। কিন্তু খুশি হলে তা তাদের কাজেই প্রকাশ পায়। মাইকেলদের গাড়োয়ানও মুখে কিছু বললো না। গাড়ি ছুটোতে ঘোড়াগুলোকে ঠিকমতো জুড়ে দেয়া হয়েছে কিনা আর একবার তা দেখে নিয়ে মাইকেলদের গাড়িতে উঠে বসলো সে। সপাং করে চাবুক পড়লো ঘোড়াগুলোর পিঠে। একই সঙ্গে ছুটে চললো তারানতাস আর তেলগা।

রওনা দেবার ঘণ্টা ছয়েক পরে একটারেনবার্গ পৌঁছলো ওরা। দুটো গাড়িই পোস্টিং হাউসের সামনে এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামলো সবাই। হঠাৎ জুলিভেট দেখতে পেলো, পোস্টিং হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক ; ভালো করে লক্ষ্য করতেই লোক-টাকে চেনা গেলো—তেলগার সেই ইমস্‌চিক। সে-ও ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ইমস্‌চিকের চোখ-মুখ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাড়ার পয়সা চাইলো সে—নির্বিকার চেহারা। ওদেরকে এভাবে পাহাড়ে ফেলে আসার জন্যে একটুও লজ্জিত মনে হচ্ছে না তাকে। ব্লাউন্ট এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো ; কিন্তু ইমস্‌চিক ভাড়ার পয়সা চাইতেই ভীষণ ক্ষেপে উঠলো সে। জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা বিরাশী সিক্কা কষালো ইমস্‌চিকের চোয়াল লক্ষ্য করে। কপাল ভালো লোকটার, সময়মতো সরে যাওয়ায় থুতনি-টা রক্ষা পেলো। ব্লাউন্ট দ্বিতীয়বার ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে আসতেই

www.boiRboi.blogspot.com

ইমস্‌চিককে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিলো জুলিভেট। ব্লাউন্টকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'খামোকা গাড়োয়ানকে দোষ দিয়ে কি লাভ, বলুন! তেলগায় এরকমটা হয় হামেশাই হচ্ছে,' তারপর ইমসচিকের হাতে কয়েকটা রুবল গুঁজে দিয়ে বললো, 'এই নাও তোমার ভাড়া ; আর নিজের ভালো চাইলে এক্ষুণি কেটে পড় এখান থেকে।'

ইমস্‌চিক চলে গেলো। কিন্তু ব্লাউন্ট এখনো রাগে ফুঁসছে। এবারে রাগ গিয়ে পড়লো গাড়ির মালিকের ওপর। 'ঠিক আছে, ইমস্‌চিককে না হয় মাফ করলাম ; কিন্তু এমন বস্তাপচা গাড়ি যে ব্যাটার তাকে জেলের ভাত খাইয়ে তবে ছাড়বো,' রেগেমেগে বললো সে।

'তার মানে গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে আপনি মামলা করতে চান ?' জানতে চাইলো জুলিভেট।

'আলবত্‌!'

'তাহলেই সেরেছে!'

'মানে ? কি বলতে চান আপনি ?' ঝাঁজের সঙ্গে জানতে চাইলো ব্লাউন্ট।

'রাশিয়ার মামলা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আপনার,' বললো জুলিভেট, 'এ ব্যাপারে মজার একটা গল্প চালু আছে। কোনো এক দাইমা আঁতুর ঘরের এক ছেলেকে বারো মাস দুধ খাইয়েছিলো —এই বাবদ বেশ কিছু টাকাও পাওনা হয়েছিলো তার। কিন্তু টাকাটা সে চাইতেই বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলো তার মনিব। বেচারি দাইমা আর কি করবে! কয়েকজনের পরামর্শে মনিবের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকলো সে। অনেক বছর পরে মামলাতে জিতেও গেলো সেই দাইমা। কিন্তু যে ছেলেটাকে দুধ খাওয়ানো নিয়ে এতোসব কাণ্ড,

সে তখন কোথায়, জানেন ?'

'কোথায় ?'

'রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে। ইম্পেরিয়াল গার্ডের কর্নেল।' বলে হো হো করে হেসে উঠলো জুলিভেট ; ব্রাউন্টও আর হাসি চেপে রাখতে পারলো না—অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে-ও।

হাসির রোল থামলে পকেট থেকে সেই নোট বইটা বের করলো জুলিভেট। তাতে লিখলো, রাশান থেকে ফ্রেঞ্চ, ডিক্সনারীর নতুন সংস্করণে একটা কথা যোগ করতে হবে : তেলগা এক ধরনের ঘোড়ায় টানা রাশান গাড়ি। যাত্রা শুরুর সময় চারটে চাকা থাকে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর আগেই দুটো চাকা গায়েব হয়ে যায়।

সাত

একটারেনবার্গের পোস্টিং হাউস থেকে গাড়ি আর ঘোড়া বদলে নিলো জুলিভেট। ভাঙা তেলগার বদলে এবার ঝকঝকে তারানতাস। আর ঘোড়াগুলোও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মাইকেলও আগের ঘোড়াগুলোকে পাল্টে নিলো। দুই গাড়ির জন্যে এবারে দুজন নতুন ইমস্‌চিক।

ভরদুপুরে যাত্রা শুরু করলো ওরা। দুটো গাড়িই পাশাপাশি ছুটে চলেছে। ধুলোবালিতে ভরা মেঠোপথ ধরে ছুটছে গাড়ি। মাঝে মধ্যে চষা জমি আর বড় বড় মাঠের ওপর দিয়েও ঘোড়াগুলো

www.boiRboi.blogspot.com

ছুটে যাচ্ছে। ঝোপঝাড় আর এবড়োখেবড়ো রাস্তা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে তারানতাস। আকাশের অবস্থা ভালোই। কয়েক চিলতে মেঘ খেলা করছে ; কিন্তু ঝড় বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।

২৩ শে জুলাই। রাতের অন্ধকার চিরে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। গাড়ি দুটো একটানা ছুটছেই। ইচিমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা—আর মাত্র ত্রিশ ভার্স্ট বাকি। এমন সময় মাইকেল লক্ষ্য করলো, দূরে একটা বালিন গাড়ি। গাড়িটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো পথে এসেছে, নইলে আগেই ওদের নজরে পড়তো। বালিনটা এগুচ্ছে খুবই ধীর গতিতে। ঘোড়াগুলোকেও বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে ; তবুও রেহাই নেই। ইমস্‌চিকের চাবুক সামনে এগুতে বাধ্য করছে ওদের। গাড়িতে কারা যাচ্ছে তা দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলো মাইকেল। তারানতাসের গতিবেগ আরো বেড়ে গেলো। মাইকেলদের দেখাদেখি জুলিভেটদের ইমস্‌চিকও গাড়ির গতিবেগ দিলো বাড়িয়ে। একটু পরে দুপাশ থেকে তারানতাস দুটো বালিনের একেবারে গায়ে এসে ভিড়লো। গাড়ি দুটোকে দেখতে পেয়ে বালিনের ভেতর থেকে কে যেন ওদের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠলো : গাড়ি থামাও। কিন্তু গাড়ি থামালো না ওরা ; বরং বালিনকে পেছনে ফেলে আরো জোর গতিতে এগিয়ে গেলো তারানতাস দুটো। বালিনের ভেতর লোকটাকে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিলো মাইকেল—লোকটার গলার স্বর যেমন কর্কশ, চেহারাটাও ঠিক তেমনি। হঠাৎ মনে হলো মাইকেলের, লোকটাকে এর আগেও কোথায় যেন দেখেছে সে।

মাইকেলরা থামবে না বুঝতে পেরে লোকটা ক্ষেপে গিয়ে ইমস্‌চিককে আরো জোরে গাড়ি ছোটাতে বললো। কিন্তু বললেই কি গাড়ি ছোটে। ঘোড়াগুলো এমনিতেই রোগা পটকা, তার উপর

পথচলায় ক্লান্ত। তাই ইমস্‌চিকের চাবুক খেয়েও বিশেষ এগুচ্ছে না ওগুলো। দেখতে দেখতে পেছনের বালিনটা একটু একটু করে ছোট হয়ে একসময় মাইকেলদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো।

সন্ধ্যার দিকে মাইকেলদের গাড়ি দুটো এসে থামলো ইচিমের পোস্টিং হাউসে। আরো আগে পৌঁছনো যেতো কিন্তু ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে পথে বারকয়েক বিশ্রাম দিতে গিয়েই এতো দেরি।

এবার আবার ঘোড়া আর ইমস্‌চিক বদলের পালা। পোস্টিং হাউসের পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর জানতে পেলো ওরা। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের হাতে সরকারি সৈন্যরা নাজেহাল হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে ইচিমও বিদ্রোহীদের দখলে চলে যেতে পারে। অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলো আগেভাগেই টবলস্ক শহরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করছে তাতার বাহিনী। ইচিমের বহু বাসিন্দা পাশের কোনো শহর বা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সবার মনে একটাই ভয়—যে কোনো সময় শহরের উপর বিদ্রোহীরা চড়াও হতে পারে।

আর একমুহূর্তও দেরি করতে রাজি নয় মাইকেল। পোস্টিং মাস্টারকে তাড়াতাড়ি নতুন ঘোড়া জুড়তে বললো সে। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সটকে পড়া যায় ততই মঙ্গল। বেশি দেরি হলে রাস্তায় বিদ্রোহীদের খপ্পরে পড়তে হতে পারে। ওদিকে বালিনে চেপে যে লোকটা আসছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এখানে। গলার আওয়াজেই বোঝা গিয়েছে, লোকটা সুবিধের নয়। এখানে পৌঁছে কোন্‌ গণ্ডগোল বাধিয়ে বসবে কে জানে!

তারানতাসে নতুন ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয়েছে। নাদিয়াকে গাড়িতে

www.boiRboi.blogspot.com

উঠতে বলে জুলিভেটদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মাইকেল বললো, 'এতোটা পথ একসঙ্গে এসে এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে খুব খারাপ লাগছে।'

'আপনার মত উপকারী বন্ধুকে পেয়ে পথেই আবার হারাতে হবে ভেবে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যাচ্ছে,' বললো জুলিভেট, 'যদি বেঁচে থাকি তাহলে আবার হয়তো দেখা হবে।'

'তাই যেন হয়,' বলে জুলিভেট আর রাউন্টের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো মাইকেল।

এমন সময় খটাখট খটাখট শব্দ করে একটা গাড়ি এসে থামলো। ঘুরে চাইলো ওরা—সেই বালিনটা। গাড়ি থেকে নামলো সেই লোকটা। পরনে মিলিটারি কায়দার পোশাক। পায়ে বুট। কোমরে ঝুলছে একটা তলোয়ার। মুখে চাপ দাড়ি, সেইসঙ্গে মানানসই গোঁফ। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

পোস্টিং হাউসে ঢুকেই বাঁজখাই গলায় হেঁকে উঠলো সে। চালচলনে মনে হচ্ছে যেন হোমরাচোমরা কোনো মিলিটারি অফিসার। কিন্তু মাইকেল ভালো করেই জানে, লোকটা সোনাবাহিনীর কেউ নয়। মিলিটারি অফিসারদের পোশাকে যে সমস্ত সাংকেতিক চিহ্ন থাকে, লোকটার জামায় সেসব নেই।

গট্‌গট্‌ করে পোস্টিং মাস্টারের রুমে এসে হাজির হলো লোকটা। পোস্টিং মাস্টারকে দেখতে পেয়ে ধমকে উঠলো সে, 'নবাবজাদা এতক্ষণ ছিলেন কোথায়, শুনি?'

'ঘোড়াগুলোর দানাপানির আয়োজন করছিলাম, হুজুর,' ভয়ে ভয়ে বললো পোস্টিং মাস্টার।

'ওসব বাদ দিয়ে জলদি আমার গাড়িতে নতুন ঘোড়া জুড়ে

দাও।'

কথা তো নয়, যেন বোলতার কামড়। —মনে মনে বললো পোস্টিং মাস্টার। কিন্তু মুখে বললো, 'আস্তাবলে নতুন ঘোড়া আর নেই, হুজুর,' তারপর মাইকেলদের গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'শেষ তিনটে ঘোড়া ঐ গাড়িটায় জুড়ে দিয়েছি। আপনি বললে ওঁদের পুরনো ঘোড়াগুলো…।'

'না,' গর্জে উঠলো লোকটা, 'যেমন করেই হোক, শিগগির নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করো; নইলে কপালে খারাবি আছে তোমার।'

'কিন্তু নতুন আর একটা ঘোড়াও যে আস্তাবলে নেই।'

'ওসব জেনে কাজ নেই আমার। আমি চাই তরতাজা নতুন ঘোড়া দরকার হলে তারানতাসের ওগুলোকে খুলে আমার গাড়িতে জুড়ে দাও—জলদি।'

পোস্টিং মাস্টারের সাথে লোকটার কথাবার্তা এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো মাইকেল, এবারে মুখ খুললো সে, 'ঘোড়াগুলো এখন আমার, পোস্টিং মাস্টারের নয়।'

'তাই নাকি! ঘোড়াগুলোর গায়ে নিশ্চয়ই তোমার নাম লেখা রয়েছে, তাই না?' বিদ্রূপ করে উঠলো লোকটা, তারপর পোস্টিং মাস্টারের দিকে ফিরে বললো, 'যদি ভালো চাও তো শিগগির ওগুলোকে খুলে নিয়ে আমার গাড়িতে লাগাও।'

লোকটার এই অভদ্র ব্যবহারে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিলো মাইকেলের; তবু নিজেকে সামলে নিলো সে। মাথা গরম করার সময় এটা নয়। এমন কোনোকিছু করা ঠিক হবে না যাতে ওর আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। ইচ্ছে করলেই সরকারি অনুমতি পত্রটা সে দেখাতে পারে, কিন্তু তাতেও ভয়। সাধারণ একজন ব্যবসায়ীর কাছে এরকম একটা

অনুমতি পত্র দেখতে পেলে লোকজনের সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক, নিজেকে যতোটা সম্ভব সংযত করে মাইকেল বললো, 'আপনি বরং অন্য কোনো ব্যবস্থা করুন, ঘোড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়, না?'

'না।'

কয়েক পা এগিয়ে এলো লোকটা। বললো, 'এমনিতে না দিলে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিতে কোনোই অসুবিধা হবে না আমার। কিন্তু তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আমরা দু'জন ডুয়েল লড়বো। কি, রাজি?' বলে কোমরে ঝুলানো তলোয়ারের খাপে হাত দিলো সে।

'না। এসব মারামারির মধ্যে আমি নেই,' যতোটা সম্ভব শান্ত হয়েই জবাব দিলো মাইকেল।

আরো রেগে গেলো লোকটা। মাইকেলের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো সে। হাতে মিলিটারি চাবুক। 'তার মানে, তুমি লড়বে না। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কয়টা বললো সে।

'না।'

'আচ্ছা! এতকিছুর পরেও তুমি লড়বে না?' বলেই চাবুকের হাতল দিয়ে মাইকেলের ঘাড়ে ভীষণ জোরে আঘাত করলো লোকটা। রাগে থরথর করে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো মাইকেলের। লজ্জা আর অপমানে ওর ফর্সা চেহারা এখন আরো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। অসাধারণ সংযমের গুণে এবারেও নিজেকে সামলে নিলো সে। মান অপমানবোধ বিসর্জন দিয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়েই রইলো। এমনকি মুখেও কোনো প্রতিবাদ করলো না। মাইকেল ভালো করেই

www.boiRboi.blogspot.com

জানে, লোকটাকে কড়া ভাষায় কিছু বলতে যাবার মানেই হচ্ছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মেনে নেয়া। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়! ডুয়েল লড়ে পৌরুষ জাহির করার চাইতে কর্তব্যের বোঝা হালকা করা ওর কাছে এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এতোকিছুর পরেও টুঁ শব্দটিও করলো না সে। এভাবে চুপ মেরে যাওয়াতে আবারো গর্জে উঠলো লোকটা, 'কি, ডুয়েল লড়বে না; না? বেজন্মা কাপুরুষ কোথাকার!' তারপর পোস্টিং মাস্টারকে বললো, 'শিগগির ঘোড়াগুলো খুলে নিয়ে আমার গাড়িতে জুড়ে দাও।'

মাইকেলের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার চেয়ে ঘোড়া খুলতে লেগে গেলো পোস্টিং মাস্টার। একটু পরে খটাখট শব্দ করে উধাও হলো বার্লিনটা।

আস্পর্ধার চূড়ান্ত দেখিয়ে গেলো লোকটা; অথচ মাইকেল কিছুই বললো না! জুলিভেট আর ব্লাউন্ট ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। যে লোক ছোরা দিয়ে ভালুক মারতে পারে তার পক্ষে এতোটা অপমান চুপচাপ হজম করে যাওয়া অসম্ভব। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি, তা কিছুতেই ভেবে পেলো না ওরা।

কিছুক্ষণ পর জুলিভেট আর ব্লাউন্টও বিদায় নিলো। যাবার আগে অবশ্য ওদের সঙ্গে যেতে অনেক সাধাসাধি করেছিলো মাইকেলকে। কিন্তু সে রাজি হয়নি; সঙ্গে নাদিয়া রয়েছে। তাছাড়া এতোটা পথ ঠাসাঠাসি করে গেলে সবারই ভীষণ কষ্ট হবে। তাই রাতটা পোস্টিং হাউসে কাটিয়ে দিয়ে পরদিন ভোরে আবার যাত্রা করবে বলে ঠিক করলো সে। একরাত বিশ্রাম পেলে ঘোড়াগুলোও আবার চাঙা হয়ে উঠবে।

www.boiRboi.blogspot.com

পোস্টিং মাস্টার ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। অপরিষ্কার দুটো রুম—কিন্তু রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেয়া যায়। দুটো বিছানারও জোগাড় হলো। সেই সঙ্গে পাওয়া গেলো অল্পকিছু খাবার-দাবার আর পানি। এ সবই পোস্টিং মাস্টারের দয়া; নইলে এতো রাতে খাবার-দাবার কিংবা পানি, কোনোটাই পাবার কথা নয়। কারণ তাতারদের ভয়ে বেশিরভাগ লোকজনই শহর ছেড়ে ভেগেছে।

যদিও মাইকেলদের খাতির যত্নের ত্রুটি করছে না লোকটা, তবু একটা অবজ্ঞার ভাব তার চোখেমুখে খেলা করছে। ব্যাপারটা অনেক-ক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে মাইকেল। এবারে পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করে বসলো সে, 'কি ব্যাপার! এতো মুচকি মুচকি হাসা হচ্ছে কেন?'

'না হেসে উপায় আছে কোনো?' চড়া গলায় উত্তর দিলো লোকটা, 'সাইবেরিয়ার কোনো লোক যে এতো কাপুরুষ হয় তা আগে জানা ছিলো না আমার।'

'কাপুরুষ, না?' বলেই পোস্টিং মাস্টারের দু'কাঁধে মাইকেল এমন জোরে চাপ দিলো যে ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে। লোকটার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, 'এখন থেকে আমার সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাও; নইলে কিন্তু বিপদে পড়বে।'

পোস্টিং মাস্টারের সাথে আর কথা না বাড়িয়ে এবারে শোবার আয়োজন করতে লেগে গেলো ওরা। বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দিলো নাদিয়া। ওকে পাশের ঘরে যেতে বলে শুয়ে পড়লো মাইকেল। কিন্তু ঘুম এলো না। সন্ধ্যাবেলার সেই অপমান আর গ্লানি কিছুতেই মন থেকে দূর হলো না তার। এতগুলো লোকের সামনে কি অপমানটাই না করলো লোকটা! ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে

উঠলো সে। নিজের অজান্তেই দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। নাদিয়া ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। মাইকেলের মাথার কাছে বসে নিজের জামার আঁচল দিয়ে দু'চোখ মুছিয়ে দিলো সে।

নাদিয়ার মনে পড়ে গেলো নিজনি-নভগরডের সেই পুলিশ স্টেশনের কথা। সেদিন মাইকেল তার পাশে এসে না দাঁড়ালে কি বিপদই না হতো! ক'দিন আগেকার ভালুক মারার ঘটনাটাও নাদিয়ার স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে রয়েছে। মাইকেল সময়মতো ছোরা না চালালে পৃথিবীর আলোবাতাস আর দেখতে হতো না তাকে। ক'দিনেরই বা পরিচয়; কিন্তু এরই মধ্যে দারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছে মাইকেলের উপর। যে যাই বলুক না কেন; নাদিয়ার চোখে মোটেই কাপুরুষ নয় সে। সেই লোকটার কাছে মাইকেলের চুপসে যাবার পেছনে যে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে, এটা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

রাত আরো গভীর হয়েছে। এতক্ষণ পাশে বসে মাইকেলকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো নাদিয়া। এতে কাজ হয়েছে খুব। সন্ধ্যাবেলার সেই গ্লানি আর অপমান মন থেকে একেবারে দূর হয়ে গিয়েছে। এবারে প্রায় জোর করেই নাদিয়াকে পাশের ঘরে পাঠালো সে। নিজেও শুয়ে পড়লো বিছানায়। শুয়ে শুয়েই প্রার্থনার ভঙ্গিতে মনে মনে বললো: ঈশ্বর, আমাকে একটু শক্তি দাও যাতে তোমার নামে দেশ ও জারের সেবা করতে পারি।

পরদিন সকাল আটটার দিকে রওনা হলো ওরা। একরাত বিশ্রাম পেয়ে ঘোড়াগুলোও চাঙা হয়ে উঠেছে। তাই গাড়িও ছুটছে জোর

www.boiRboi.blogspot.com

গতিতে। ধীরে ধীরে ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো শহরটা; পেছনে পড়ে রইলো একরাশ বেদনাময় স্মৃতি। সেসব আর মনে করতে চায় না মাইকেল। কিন্তু সেই বেয়াড়া লোকটার চেহারা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঘুরেফিরে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে—লোকটাকে এর আগেও কোথায় যেন দেখেছে সে। লোকটা কে, আর যাচ্ছেই বা কোথায়—সবকিছু জানতে হবে। বলা যায় না, হয়তো শত্রুপক্ষেরও কেউ হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে আগেভাগেই সাবধান হতে হবে।

বিকেল চারটের দিকে আবাটস্কেইয়ায় পৌঁছে গেলো তারানতাস। এখান থেকে সামনের দিকে যেতে হলে ছোট একটা নদী পেরুতে হবে। কিন্তু নদী পারাপারের জন্যে ফেরি কিংবা অন্য কোনো কিছুই নজরে পড়লো না। গাড়ি থেকে নামলো মাইকেল। অনেক খুঁজেপেতে একটা ডিঙি নৌকো পাওয়া গেলো। নৌকোটা বেশ বড়। নৌকোর মালিকের কাছ থেকে জানা গেলো, ফিওফার খানের বাহিনী আসছে শুনেই যে যেভাবে পেরেছে চম্পট দিয়েছে। আর সেজন্যেই নদীতে একটাও নৌকো দেখা যাচ্ছে না। তাতার বাহিনী গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগুচ্ছে। ফসলের ক্ষেত ছারখার করে দিচ্ছে। দুধের শিশু থেকে শুরু করে আশি বছরের বুড়োও রেহাই পাচ্ছে না ওদের হাত থেকে।

আর দেরি না করে গাড়িশুদ্ধ ওরা চড়ে বসলো নৌকোয়। ছোট নদী। তাই ওপারে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগলো না। পৌঁছেই গাড়ি ছাড়তে বললো মাইকেল—একমুহূর্ত সময়ও বাজে নষ্ট করতে চায় না সে।

গাড়ি ছুটছে জোরগতিতে। মাঝেমধ্যে ইমস্‌চিকের চাবুক ঘোড়া-

গুলোকে সজাগ করে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যাবার পর নাদিয়াই প্রথম নীরবতা ভাঙলো, 'ওমস্কে পৌঁছেই তো মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন, তাই না?'

'না। হাতে সময় এতোই অল্প যে মায়ের সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না। আর মা এখন ওমস্কে আছেন কিনা কে জানে! তাতারদের ভয়ে সবাই তো শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।'

'কিন্তু উনি শহরে থেকে থাকলে আপনার অন্তত একটিবার দেখা করা উচিত।'

'না,' বললো মাইকেল, 'মায়ের সঙ্গে দেখা করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।'

'আপনি কেবল না-না করছেন কেন?' একটু যেন বিরক্ত এবং অবাকই হলো নাদিয়া, 'এতদিন পর বাড়ি ফিরছেন অথচ মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না?'

'নাদিয়া!' অনুনয় ফুটে উঠলো মাইকেলের কণ্ঠে, 'এ ব্যাপারে আর কিছু জানতে চেয়ো না, প্লিজ। শুধু এটুকু জেনে রাখো, যে দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ছুটে চলেছি, মায়ের সঙ্গে দেখা করার চাইতেও তা গুরুত্বপূর্ণ।'

আর কথা বাড়ালো না নাদিয়া। মাইকেলের উপর পুরোপুরি আস্থা রয়েছে তার। মায়ের সঙ্গে দেখা না করার পেছনে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। —মনে মনে ভাবলো সে।

২৫ তারিখ বিকেলে ইরতিশ নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলো ওরা। এখানেও ফেরির কোনো ব্যবস্থা দেখতে পেলো না মাইকেল। কিন্তু নৌকো পাওয়া গেলো—বেশ বড় একটা ডিঙি নৌকো। গাড়ি আর ঘোড়া নৌকোয় তুলতেই লেগে গেলো প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর শুরু

www.boiRboi.blogspot.com

হলো নদী পাড়ি দেয়া।

ইরতিশ খুব বড় নদী নয়। কিন্তু পাহাড়িয়া নদী হওয়ায় স্রোত বড্ড বেশি। আর এজন্যেই মাইকেলদের নৌকোটা এগুচ্ছে খুব ধীর গতিতে। বৈঠা বাইতে গিয়ে মাঝিদের ঘাম ছুটে যাচ্ছে।

একটু একটু করে মাঝনদীতে চলে এলো নৌকো। হঠাৎ পানির ঘূর্ণিতে আটকে গেলো ওরা। বৈঠা বাইতে বাইতে মাঝিরাও কিছুটা বেখেয়াল হয়ে পড়েছিলো, তাই আগে থেকে সাবধান হবার কোনো সুযোগই পেলো না কেউ। নৌকোটা চরকির মতো কেবল ঘুরছেই। মাঝিরাও প্রাণপণে বৈঠা বাইছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আস্তে আস্তে নৌকোর গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। শিগগির কিছু একটা করা না গেলে নৌকোশুদ্ধ সবাইকে ডুবে মরতে হবে।

এবারে মাইকেল বৈঠা হাতে নিলো। এতে উৎসাহ পেয়ে মাঝিরাও আরো জোরে জোরে বৈঠা বাইতে লাগলো।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো সবাই। ঘূর্ণি থেকে আচমকা হাত দশেক দূরে ছিটকে বেরিয়ে গেলো নৌকোটা। মাঝিরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু না; কয়েকবার উল্টোপাল্টা দুলুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেলো নৌকোটা। মাঝিরা আবার বৈঠা লাগালো—এবারে তরতর করে আবার ছুটে চললো ওদের নৌকো।

তীরে ভিড়তে আরো খানিকটা বাকি। এমন সময় 'তাতার', 'তাতার' বলে একজন মাঝি চিৎকার করে উঠলো। ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এলো মাইকেল। দূরে একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে যেটুকু বোঝা গেলো, তাতে সংখ্যায় ওরা কুড়ি পঁচিশজনের কম হবে না। নৌকোটা ওদের দিকেই ছুটে আসছে। তাতার সৈন্যদের দেখতে পেয়ে ভয়ে চুপসে গেল মাঝিরা। এতে ক্ষেপে গিয়ে

গর্জে উঠলো মাইকেল, 'খবরদার! আমার হুকুম ছাড়া কেউ নৌকো থামাবে না।'

দেখতে দেখতে তাতারদের নৌকোটা মাইকেলদের একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। নৌকো থেকে তাতার সৈন্যরা গর্জন করছে : সারিন না কিচো, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করো। এতে রাজি থাকলে হাতের সবকিছু ফেলে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। কিন্তু মাইকেলরা এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বৈঠা বেয়েই চললো। আর একটু এগুলেই তীর। কিন্তু তীরে আর পৌঁছনো হলো না ওদের ; এর আগেই মাইকেলদের নৌকো লক্ষ্য করে একঝাঁক গুলি ছুটে এলো। ভয়ে চিৎকার করে উঠলো মাঝিরা। ঘোড়াগুলোর চিঁহি শব্দে কান পাতা দায়। আবারো গুলি করলো তাতার বাহিনী। এবারে দুটো ঘোড়াই মারাত্মকভাবে জখম হলো। তাতারদের নৌকো এবারে ডিঙিটার গায়ে এসে ভিড়েছে। একজন মাইকেলকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়ে মারলো। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বল্লমের উল্টো দিকটা এসে লাগলো ওর পিঠে। তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লো পানিতে। ঐ অবস্থাতেই চেঁচিয়ে উঠলো মাইকেল, 'নাদিয়া, জলদি পানিতে লাফিয়ে পড়।' কিন্তু পানিতে ঝাঁপ দেবার আগেই কয়েকজন তাতার সৈন্য ওদের নৌকোয় উঠে এলো। প্রথমেই মাঝিদেরকে একে একে খুন করলো ; তারপর নাদিয়ার অচেতন দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিজেদের নৌকোয় তুলে নিলো। তাতাররা যাবার আগে মাইকেলদের ডিঙি নৌকোয় বড় বড় কয়েকটা ফুটো করলো ; ঘোড়া আর গাড়িসমেত নৌকোটা ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো পানিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

আট

ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলো মাইকেল। ভালো করে চারদিকে একবার তাকালো সে। ছোট্ট একটা চালাঘর। ঘরে আসবাবপত্র বলতে শুধুমাত্র একটা তক্তপোশ ; আর তাতেই শুয়ে আছে সে। মাথার কাছে বসে রয়েছে একটা লোক। চেহারা দেখে কৃষক বলেই মনে হচ্ছে লোকটাকে। মাইকেলকে চোখ মেলতে দেখে খুশি হয়ে উঠলো সে।

আস্তে আস্তে পুরো ঘটনাটাই মাইকেলের মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। তাতার গুণ্ডারা প্রথমে মাঝিদের খুন করেছে। তারপর নাদিয়াকে ওদের নৌকোয় তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ডুব সাঁতারের ফাঁকে ফাঁকে সবকিছুই দেখেছে সে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো ওর। নাদিয়ার কপালে কি ঘটেছে কে জানে। আদৌ বেঁচে আছে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়! নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হলো। নাদিয়াকে সঙ্গে করে সে-ই এতদূর নিয়ে এসেছে —নিজের সুবিধের জন্যে! —এসব ভাবতে ভাবতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে।

পেছনে হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করলো মাইকেল। রক্ষে যে, বল্লমের উল্টো দিকটা এসে লেগেছিলো পিঠে। অবশ্য

তাতেও জখম খুব একটা কম হয়নি। তবু অসম্ভব মনের জোর থাকায় সাঁতরে তীর পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলো সে। এর পরের ঘটনা আর কিছুই মনে নেই তার।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো মাইকেল। পাশে বসা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে আমি এলাম কি করে?'

'আপনি ইরতিশের পাড়ে পড়ে ছিলেন, হুজুর,' মাইকেলকে এক-জন কেউকেটা ঠাউরে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো লোকটা, 'সেখান থেকে আমিই আপনাকে এখানে নিয়ে আসি।'

'এই এলাকার নাম কি?'

'এটা ছোট একটা গ্রাম, হুজুর! ইরতিশের দক্ষিণ পাড় থেকে সামান্য একটু দূরে।'

'আচ্ছা, কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?'

'কতক্ষণ কি বলছেন! আজ তিনদিনের মাথায় আপনি প্রথম চোখ মেলে চাইলেন। এ কদিন গায়ে ভীষণ জ্বরও ছিলো আপনার।'

সেরেছে! —মনে মনে বললো মাইকেল। একেই তো বিভিন্ন জায়গায় দেরি হয়ে গিয়েছে; তার ওপর আবার পাক্কা বাহাত্তুর ঘণ্টা নষ্ট! তাতার বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে ইরকুটস্কে পৌঁছনোই এখন দারুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ ইরকুটস্কের পথে যেতে গিয়ে অনেক এলাকাই তাতার সৈন্যরা দখল করে নিচ্ছে। এখন ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সামনে এগুনোই বিপদ। তবু যেতে ওকে হবেই। এতে যতো দেরি হবে, গ্যাও ডিউকের জীবন ততই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই আর একমুহূর্তও দেরি করলো না মাইকেল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। মাইকেলকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলো লোকটা, 'এ কি করছেন, হুজুর! এতো দুর্বল শরীরে

www.boiRboi.blogspot.com

যাত্রা করলে পথে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।'

লোকটার সহজ সরল আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলো মাইকেল। কোনো রকম চেনা জানা নেই অথচ এ কদিন ওর জন্যে সে কিই না করেছে! লোকটার সেবাযত্ন না পেলে ওকে হয়তো ইরতিশের তীরেই মরে পড়ে থাকতে হতো। কৃতজ্ঞতায় গদ্ গদ্ হয়ে উঠলো মাইকেল, 'ভাই, তোমার এই উপকারের কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার। আরো দু'চারটে দিন এখানে কাটিয়ে যেতে পারলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু কাজটা ভীষণ জরুরী; আমাকে এক্ষুণি রওনা হতে হবে।'

'বেশ। তাহলে ঈশ্বরের নাম করে বেরিয়ে পড়ুন, হুজুর। আর হ্যাঁ; এই যে আপনার টাকার থলে,' বলে তক্তপোশের নিচ থেকে একটা থলে বের করে মাইকেলের হাতে তুলে দিলো লোকটা, 'বেখে-য়ালে যাতে হারিয়ে না যায় তাই আপনার কোমর থেকে খুলে রেখে-ছিলাম থলেটা।'

লোকটার সততায় আরো একবার মুগ্ধ হলো মাইকেল। থলে থেকে বেশ কিছু রুবল নিয়ে জোর করে লোকটার হাতে গুঁজে দিলো সে। তারপর বললো, 'এখন প্রয়োজন একটা ঘোড়ার; আশেপাশে কোথাও কিনতে পাওয়া যাবে?'

'জি, না। তাতার সৈন্যরা এদিক দিয়ে যাবার সময় সমস্ত ঘোড়া আর গবাদি পশু মেরে সাফ করে দিয়ে গেছে,' বললো লোকটা। 'অবশ্য চিন্তার কিছু নেই; হেঁটে ওমস্ক পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই ঘোড়া পেয়ে যাবেন।'

'ওমস্ক এখান থেকে কদ্দূর?'

'মাত্র পাঁচ ভার্স্ট, হুজুর। জোরে পা চালালে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

চালাঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো মাইকেল ; সঙ্গে সেই লোকটাও। কয়েক পা এগুতেই মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে উঠলো ওর। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে না ফেললে হয়তো মাটিতেই পড়ে যেতো। একেই দুর্বল শরীর, তার ওপর এই তিনদিন পেটে তেমন কিছুই পড়েনি। লোকটা এসেছিলো একটু এগিয়ে দেবে বলে ; কিন্তু মাইকেলের এ অবস্থায় ওকে কিছুতেই একলা যেতে দিতে রাজি হলো না সে। বললো, 'এতো দুর্বল শরীর নিয়ে কিছুতেই একলা যাওয়া ঠিক হবে না আপনার। আমি বরং সঙ্গে যাই।'

'বেশ ; চলো তাহলে,' বলে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলো মাইকেল।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ চিঠিটার কথা মনে হলো মাইকেলের। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকটা। পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়নি তো ? বুক পকেট থেকে বের করলো চিঠিটা। ভাগ্যিস একটা কাগজ দিয়ে খাম-টা আগেই মুড়ে নিয়েছিলো সে ; তাই একটুও ভেজেনি।

ওমস্কে পৌঁছে মনটা খারাপ হয়ে গেলো মাইকেলের। তাতার সৈন্যরা এরই মধ্যে শহরের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে নিয়েছে। তবে অনেক দূরে শহরের কেন্দ্রস্থল ছাড়িয়ে আরো উত্তরে রাশিয়ার পতাকা উড়ছে। এর মানে, তাতাররা এখনো ওদিকটা কব্জা করতে পারেনি। দূর থেকে স্যালুট ঠুকে দেশের পতাকার প্রতি সম্মান দেখালো সে।

রাস্তায় রাস্তায় তাতার সৈন্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বভাবে লুটেরা হলে কি হবে। নিয়ম শৃঙ্খলা এবং চলাফেরায় এরা সুশৃঙ্খল সেনাদলের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। শহরের এদিকটায় ব্যব-সায়ীদের আড্ডা। নানারকম দোকানপাট আর বেশ কয়েকটা কাঁচা

www.boiRboi.blogspot.com

বাজার চোখে পড়লো। তাতার সৈন্যরা শহরে ঢুকে প্রথমেই এসব বাজার আর দোকানপাট লুট করেছে। দোকানগুলোয় তাই কোনো লোকজন দেখতে পেলো না মাইকেল। বাজারগুলোরও একই দশা।

লোকটাকে সাথে করে এবারে পোস্টিং হাউসের দিকে এগুলো মাইকেল। এমন সময় খটাখট্ খটাখট্ শব্দে চমকে উঠলো ওরা। একদল অশ্বারোহী তাতার সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে! চট্ করে একটা দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ওরা। রাস্তায় যে সমস্ত লোকজন হাঁটাচলা করছিলো তাদেরকে বর্শার গুঁতোয় সরিয়ে দিয়ে তাতার সৈন্যরা পথ করে নিচ্ছে। জনাবিশেকের এই দলটাকে যে লোকটা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্য সবার চাইতে আলাদা। কোমরে ঝুলছে তলোয়ার। অশ্বারোহীরা আরো কাছা-কাছি আসতেই লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেলো মাইকেল— চমকে উঠলো সে। ফিস্‌ফিসিয়ে তার সঙ্গীর কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, 'যে লোকটা আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, ওকে চেনো ?'

'চিনবো না মানে ?' ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠলো লোকটা, 'ও'ই তো আইভান ওগারেফ! আমাদের এলাকা দিয়ে যাবার সময় গ্রামের লোকজনদের ওপর ও কি অত্যাচারটাই না করলো! সেসব ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে।'

আইভান ওগারেফ! —দাঁতে দাঁত চেপে নামটা উচ্চরণ করলো মাইকেল। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে এখন পানির মতো পরি-ষ্কার। এ'ই সেই লোক যার সঙ্গে নিজনি-নভগরডের মাঠে রাতের বেলায় দেখা হয়েছিলো ওর। ককেসাস স্টীমারের সেই আলখাল্লায় মোড়া জিপসী ভদ্রলোকটিও ইনিই! তারপর কশাক সৈন্যদের চোখে

ধুলো দিয়ে সাইবেরিয়ার মাটিতে ঢুকতে নিশ্চয়ই খুব একটা কষ্ট হয়নি তার। আর ইচিমের পোস্টিং হাউসের ঘটনা তো মাত্র সেদিনের ব্যাপার। মিলিটারির ছদ্মবেশে সেই লোকটাই যে আইভান ওগারেফ একথা আগে জানতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেতো মাইকেলের। ইয়াতাঘানের একটা কোপ কিংবা রিভলবারের এক গুলিতেই গোটা রাশিয়ার অর্ধেক বিপদ কেটে যেতো।

পোস্টিং হাউসে পৌঁছলো ওরা। লোকজনের ভিড়ে সেখানে পা-ফেলাই দায়। সবাই এসেছে গাড়ি কিংবা ঘোড়ার খোঁজে। এরমধ্যেই সমস্ত গাড়ি ভাড়া হয়ে গিয়েছে। এখন পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র ঘোড়া। তা'ও আবার সংখ্যায় খুব একটা বেশি নয়। লোকের যেরকম ভিড় তাতে কিছুক্ষণের মধ্যে ওগুলোও হয়তো ভাড়া হয়ে যাবে।

পোস্টিং মাস্টারকে ঘোড়ার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সেই লোকটাসহ আস্তাবলের দিকে এগুলো মাইকেল। আস্তাবলের সামনে লোকজন গিজ্‌গিজ্‌ করছে। গাড়ি কিংবা ঘোড়া জোগাড় করে যে যেভাবে পারছে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মুখরোচক গালগল্পে মেতে উঠেছে—ফিস্‌ফিস্‌ করে তাতার সেনাদের সমালোচনাও করে যাচ্ছে কয়েকজন। মাইকেল কিংবা তার সঙ্গী এসব আলাপের ধারে কাছেও গেলো না। এতো লোকজনের মাঝে ছদ্মবেশী তাতার গুপ্তচর থাকা বিচিত্র কিছু নয়। তাই আগে থেকেই সাবধান হলো ওরা। এমন সময় কে যেন মাইকেলের নাম ধরে ডেকে উঠলো। পেছন ফিরে চাইলো সে।

একজন বুড়ি 'মাইকেল' 'মাইকেল' বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে। বুড়ি মেয়েলোকটা আর কেউ নয়—ওরই মা, মার্ফা স্ট্রগফ।

www.boiRboi.blogspot.com

দু'হাত বাড়িয়ে মাইকেলকে জড়িয়ে ধরার জন্যে এগিয়ে আসছে বুড়ি; চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে যেন। এতদিন পর মাকে দেখতে পেয়ে মাইকেলও কম খুশি হয়নি; ইচ্ছে হচ্ছিলো সমস্ত দায়িত্ববোধ ভুলে গিয়ে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কিন্তু তা তো হবার নয়। কর্তব্যের বোঝা হালকা না করে ভাবাবেগে সাড়া দেবার মতো লোকই নয় সে। তাই চট্‌ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, মায়ের ডাকে কিছুতেই সাড়া দেবে না; বরং মিথ্যে কথা বলে পরিচয় গোপন করে যাবে।

কাছে এসেই মাইকেলের হাত চেপে ধরে বুড়ি বললো, 'কি রে! আমার সঙ্গে দেখা না করে কোথায় যাচ্ছিস, তুই? এদ্দিন পর দেশে ফিরলি, অথচ বুড়ি মা'কে একবারও মনে পড়লো না তোর?' বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো মার্ফা, 'যাক, এখন শিগগির আমার সঙ্গে বাড়ি চল।'

কর্তব্য টর্তব্য শিকেয় তুলে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দেবার জন্যে মনটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যে—অসাধারণ মনের জোরে এবারও নিজেকে সামলে নিলো মাইকেল। তারপর চড়া স্বরে বললো, 'আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। আমার নাম মাইকেল নয়। এবারে হাতটা ছাড়ুন তো!'

এবার বুড়ির অবাক হবার পালা। মাইকেলের কাটা কাটা উত্তর শুনে এক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে! তুমি কি পিটার স্ট্রগফের ছেলে নও?'

'বাবা তো দূরের কথা। আমাদের চোদ্দ গুষ্টিতেও ঐ নামে কেউ নেই,' গলাটা খাদে নামালো মাইকেল। 'আসল কথা কি জানেন, আপনার বয়সের সবাই একটু-আধটু ভুল করে। আপনার ছেলে দেখতে হয়তো আমারই মতো; তাই চিনতে ভুল হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বাবা। দেখতে সে একেবারে অবিকল তোমার মতো। চুল, চোখ কান নাক আর গায়ের রঙে দুজনার মাঝে একটুও ফারাক নেই। তো কি যেন নাম তোমার, বাবা?'

'নিকোলাস কোর্পানফ। বাড়ি ইরকুটস্কে।'

আর কথা বাড়ালো না মাইকেল। লোকটাকে সাথে করে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলো। ওদিকে, একটা বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়লো মার্ফা। তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি মাইকেল। বুড়ি ছেলেকে ঠিকই চিনেছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে এই লুকোচুরি কেন? ছেলেবেলা থেকেই মাইকেল সাহসী আর রাশভারী। বিনা কারণে মায়ের কাছে পরিচয় লুকোনোর মতো ছেলে সে নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে যার জন্যে মায়ের কাছেও ওকে পরিচয় গোপন করতে হয়েছে। —মনে মনে ভাবলো মার্ফা। মনের মাঝে আর কোনো খেদ রইলো না তার।

লোকজনের ভিড়ে মা ও ছেলের দিকে কেউ ফিরেও চাইলো না —শুধুমাত্র একজন ছাড়া। সাদা পোশাকে তাতারদের একজন গুপ্তচর প্রথম থেকেই ওদের দু'জনের কথাবার্তা কান পেতে শুনছিলো। মাইকেল আস্তাবলের দিকে এগুতেই সে'ও পোস্টিং হাউস থেকে বেরিয়ে সোজা তাতার ছাউনির দিকে রওনা দিলো। মাইকেল কিংবা তার মা এসবের কিছুই জানলো না।

পোস্টিং হাউসের বেঞ্চিতে বসে ঝিমুচ্ছে মার্ফা। হঠাৎ পিঠের ওপর শক্ত একটা হাত এসে পড়লো। পেছন ফিরে চাইলো সে। একজন তাগড়াই তাতার ফৌজ ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে। বুড়ি পেছন ফিরতেই হেঁকে উঠলো তাতার সৈন্যটা, 'এই বুড়ি, শিগগির আমার পেছন পেছন এসো। তুমি এখন তাতার ফৌজের বন্দী।'

www.boiRboi.blogspot.com

মার্ফা প্রতিবাদ করে কি যেন বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রইলো তার। আবারও গর্জন করে উঠলো তাতার সেনা, 'যদি নিজের ভালো চাও তো শিগগির আমার সঙ্গে চলো, নইলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে সৈন্যটার পেছন পেছন হেঁটে চললো মার্ফা। একটু পরেই ওরা পৌঁছে গেলো তাতার ছাউনিতে।

ছাউনিতে ঢুকেই আইভান ওগারেফকে দেখতে পেলো মার্ফা— একটা চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছে। চেয়ারের দুধারে চারজন দেহরক্ষী। তাতার সৈন্যটা ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে চাইলো আইভান। সঙ্গে মার্ফাকে দেখতে পেয়ে সৈন্যটার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাইলো সে। এবার তাতার সেনাটা বলে উঠলো, 'হুজুর, এ-ই সেই বুড়ি।'

মার্ফার আপাদমস্তক ভালো করে পরখ করলো আইভান; তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

নিজের নাম বললো মার্ফা।

'পোস্টিং হাউসে যার সঙ্গে কথা বলছিলে সেই লোকটা কে?'

'ইরকুটস্কের একজন ব্যবসায়ী। ওকে আমার ছেলে বলে ভুল করেছিলাম।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলো আইভান, 'ও'ই তোমার ছেলে, মাইকেল স্ট্রগফ।'

'হুজুর, আমার বয়স হয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পাই না। লোকটাকে আমার ছেলের মতোই মনে হচ্ছিলো, তাই 'মাইকেল' 'মাইকেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আসলে অনেক দিন থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা নেই, তাই ওর বয়েসী কাউকে দেখলেই মনটা উতলা হয়ে ওঠে। যাকে এর আগে কোনোদিন হয়তো দেখিইনি,

তাকেই মাইকেল ভেবে ভুল করে বসি। এ নিয়ে দশবার ভুল হলো আমার।'

'চুপ কর্, হারামজাদী,' মার্ফার কথায় ভীষণ রেগে গেলো আইভান, 'ভালোয় ভালোয় যদি সবকিছু স্বীকার না করিস্ তাহলে কপালে খারাবি আছে তোর। পেট থেকে কথা কি করে বার করতে হয় তা ভালো করেই জানা আছে আমার।'

'বিশ্বাস করুন, হুজুর,' কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগলো মার্ফা, 'লোকটা মাইকেলের মতো দেখতে—কিন্তু ও আমার ছেলে নয়। নাম জানতে চাইলে বললো, নিকোলাস কোর্পনফ। ইরকুটস্কে ব্যবসা করে। হুজুর, সামান্য মেয়েলোক আমি। বয়স হয়েছে। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি। দয়া করে ছেড়ে দিন আমায়।'

'ছেড়ে দেবো, না? যদি নিজের ভালো চাস্ তো জলদি সত্যি কথাটা বলে ফ্যাল্। নইলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেবো। তারপর কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো মার্ফা; দু'চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝরছে। আইভান ইশারা করতেই একজন সৈন্য এসে মার্ফাকে কয়েদখানার দিকে টেনে নিয়ে গেলো। এবারে ঘরে ঢুকলো কয়েকজন তাতার সেনাপতি। তাদের উদ্দেশ্যে আইভান বললো, 'মাইকেলের চেহারার বর্ণনা দিয়ে এক্ষুণি সব জায়গায় আমাদের গুপ্তচর পাঠাও। ধরা ওকে পড়তেই হবে; নইলে আসল পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে।'

'বুড়িটার কি ব্যবস্থা হবে, হুজুর?' জিজ্ঞেস করলো একজন।

'বন্দীদের সঙ্গে ওকেও নিয়ে যাওয়া হবে। এর মধ্যে যদি মাইকেল ধরা পড়ে তো ভালো; তা নাহলে যেভাবেই হোক, বুড়ির মুখ

খোলাতে হবে। ও নিশ্চয়ই জানে, মাইকেল কোথায় গিয়েছে।'

ঘোড়া ভাড়া করলো মাইকেল। দেরি করার মতো এক মুহূর্ত সময়ও আর হাতে নেই। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো সে। এবার বিদায়ের পালা। ঘোড়ায় বসেই লোকটার সঙ্গে করমর্দন করে মাইকেল বললো, 'আমার জন্যে তুমি যা করলে, তার প্রতিদান দেবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কোনো একদিন হয়তো জানতে পারবে, তোমার এই সাহায্যটুকু দেশের কতো বড় উপকারে এসেছে।'

'আমি কোনোকিছুই জানতে চাই না, হুজুর। এই সামান্য কর্তব্যটুকু পালন করতে গিয়ে অজান্তে দেশের কোনো উপকার যদি করেই ফেলি, তো জন্ম সার্থক আমার।'

'চলি। যদি বেঁচে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো মাইকেল।

একটানা চারঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে সত্তর ভার্স্ট পথ পাড়ি দিলো মাইকেল। ওমস্ক ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে সে। মাঝে মধ্যে ঘোড়া থামিয়ে তাতার সৈন্যদের খবর নিচ্ছে; এছাড়া ওকে অনুসরণ করে পেছন পেছন কেউ আসছে কিনা তা'ও লক্ষ্য করছে। একটা কথা সে বেশ বুঝতে পেরেছে; জারের দূত পাঠানোর খবরটা শত্রুপক্ষের কাছে আর গোপন নেই। আর সেই দূত কোথায় যাচ্ছে তা'ও তাদের অজানা নয়। এখন ইরকুটস্কের পথে সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই বাধা দেবে ওরা। অবশ্য শত্রুপক্ষের কেউ এখনো ওর আসল পরিচয় জানে না।—মনে মনে ভাবলো মাইকেল। অথচ বেচারা জানলোও না, ওর বুড়ি মা এখন আইভান ওগারেফের হাতে বন্দী; আর ওর আসল পরিচয়ও শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওকে ধরার জন্যে চারদিক থেকে তাতার সেনারা ধেয়ে আসছে।

গ্রামের পর গ্রাম পেরুচ্ছে মাইকেল। ঘোড়াটাকে মাঝে মধ্যে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে নিজেও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। তারপর আবার ছুট। মাঝে মধ্যে জলাভূমি টপকাতে হচ্ছে। একেকটা জলাভূমি আবার এক ভার্স্টের কাছাকাছি লম্বা। এখানে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে গেলেই বিপদ—জলাভূমির বিষাক্ত মশা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। অবশ্য ঘোড়সওয়ারের চাইতে ঘোড়ার দিকেই ওদের নজর বেশি। জলাভূমির ওপর দিয়ে যাবার সময় মশার বিষাক্ত কামড়ে ঘোড়া একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন একমাত্র উপায় আক্রান্ত স্থানে চর্বি মালিশ করা ; এতে অনেকটা আরাম হয়। তাই আগেভাগেই খানিকটা চর্বি জোগাড় করে নিয়েছে সে। জলাভূমির ধারে কাছের গ্রামবাসীরাও মশার কামড়ে অস্থির। মশা তাড়ানোর জন্যে ওরা গাছপালা পুড়িয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হয় না। গ্রামের পথ দিয়ে যাবার সময় মাইকেল লক্ষ্য করেছে, মশার কামড় খেয়ে লোকজনের চেহারাই যেন পাল্টে গিয়েছে।

জলাভূমি আর জলাভূমি! এখান থেকে ইরকুটস্ক পর্যন্ত পথের অবস্থা প্রায় এইরকম। মাঝেমধ্যে দু'চারটে কাদার ব্রিজও চোখে পড়ছে। ঘোড়া কিংবা লোকজন চলাচলের জন্যে থক্‌থকে কাদার চাঁইকে শুকিয়ে নিয়ে একটার পর একটা সাজিয়ে দেয়া হয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। এতে সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হচ্ছে বেশি। এবড়ো-খেবড়ো মাটির ঢেলা পেরুতে গিয়ে ঘোড়া তাল সামলাতে না পেরে কখনো কখনো জলাভূমিতে ছিটকে পড়ছে। তবুও চলার বিরাম নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

যতটুকু বিশ্রাম না নিলেই নয়, কেবল ততটুকুই নিচ্ছে সে।

৩০ জুলাই ইলামস্ক পৌঁছে গেলো মাইকেল। পয়লা আগস্ট পৌঁছলো স্পাসকোয়। ঐদিনই বিকেলে পোক্রোসকোতে পৌঁছে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করলো সে—ঘোড়ার একটু বিশ্রাম দরকার ; সেইসঙ্গে নিজেরও। পরদিন সকালবেলায় আবার শুরু হলো যাত্রা ; রাত ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেলো আইকৌলস্কয়।

৪ আগস্ট রাতে কামস্কে পৌঁছলো মাইকেল। শহরটা বারাবা প্রদেশের ঠিক মাঝামাঝি। স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে এই শহরের সুনাম রয়েছে। একটা সরাইখানায় ঢুকে পড়লো মাইকেল। রাতটা এখানে কাটিয়ে পরদিন ভোরে আবার রওনা হবে সে।

রাতে শুয়ে শুয়ে নানান বিষয়ে চিন্তা করছিলো মাইকেল। মস্কো থেকে রওনা দিয়েছে দিন বিশেক আগে। কিন্তু ইরকুটস্ক এখনো অনেক দূরের পথ। সময়মতো গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতে চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারবে তো? যেভাবে আইভান পেছনে লেগেছে তাতে শেষ পর্যন্ত একাজে সফল হতে পারবে কিনা সন্দেহ! এখন থেকে এক মুহূর্ত সময়ও আর নষ্ট করা চলবে না। গ্র্যাণ্ড ডিউককে বিপদ থেকে রক্ষা করতে চাইলে, তাতাররা পৌঁছনোর আগেই ওকে ইরকুটস্কে পৌঁছতে হবে। —এসব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো মাইকেল।

নয়

ধোঁয়া।

কামস্ক ছেড়ে মাত্র কয়েক ভার্স্ট এগুতেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়লো মাইকেলের। দূরের আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়। এ নিশ্চয়ই তাতার ফৌজের কাজ; গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে সামনে এগুচ্ছে ওরা। ঘোড়ার গতিবেগ দিলো বাড়িয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গ্রামে এসে পৌঁছলো সে। এখান দিয়ে যাবার সময় তাতার সেনারা সমস্ত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কয়েকটা চালাঘর থেকে এখনো আগুন বেরুচ্ছে।

একটা পোড়া চালাঘরের সামনে কোলে শিশু নিয়ে অল্পবয়েসী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো মাইকেল, 'এ নিশ্চয়ই তাতার গুণ্ডাদের কাজ, তাই না?'

'তাছাড়া আবার কি? গুণ্ডারা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার সবকিছুই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে,' ধরা গলায় বললো মেয়েটা।

'তোমার বাবা মা কিংবা অন্যান্যরা সবাই কোথায়?'

'এসব জেনে আপনার লাভ? পারবেন, আমার বাবা মা আর ভাই বোনদের গুণ্ডাবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করতে?' বলতে

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো মেয়েটা।

মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মাইকেল। তারপর বললো, 'বোন, গুণ্ডাদের হাত থেকে ওদেরকে উদ্ধার করতে পারবো কিনা জানি না; তবে এটুকু জেনে রেখো—শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তাতারদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।'

ওর এই কথায় চুপ মেরে গেলো মেয়েটা। তাই দেখে মাইকেলই জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, এখান দিয়ে যে দলটা গিয়েছে তারা সংখ্যায় কতোজন হবে?'

'দল বলছেন কি, বলুন বাহিনী! বোখারার আমীর ফিওফার খান এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। কম করে হলেও সংখ্যায় ওরা হাজার দুয়েক হবে।'

'আমীরের দলটা কোন্‌দিকে গিয়েছে বলে মনে হয়?'

'খুব সম্ভবতঃ টমস্কের দিকে। সৈন্যরা এখান দিয়ে যাবার সময় টমস্কের কথাই বলাবলি করছিলো। মনে হয় ওরা আগে টমস্কে, তারপর কলিভানের দিকে যাবে।'

'অনেক ধন্যবাদ। এখন বলতো, তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'আমার জন্যে ভাববেন না। কয়েকটা চালা আর বেড়া জোগাড় করে ঘরটা ঠিক করে নেবো। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়—নিজেই পারবো। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। এখন থেকে হুঁশিয়ার হয়ে সামনের দিকে এগুবেন। তাতার সৈন্যরা চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে। বেখেয়াল হলেই বিপদ।'

'তোমার উপদেশ মনে থাকবে আমার। এখন এই টাকা কয়টা ধরো তো?' বলে কয়েকটা রুবল মেয়েটার হাতে গুঁজে দিলো মাই-

কেল। তারপর ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

যেতে যেতে মাইকেল ভাবছিলো—ফিওফার খানের বাহিনী এতক্ষণে নিশ্চয়ই টমস্কে পৌঁছে গিয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে টমস্কের দিকে না গিয়ে কলিভানে যাওয়াই নিরাপদ। এতে একটু ঘুরপথ হয় ঠিকই; কিন্তু এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে ইরকুটস্ক পৌঁছনো।

এখন কলিভানে যেতে হলে মাইকেলকে প্রথমেই ওবী পেরুতে হবে। কিন্তু ওবী নদী এখনো চল্লিশ ভার্স্ট দূরের পথ। নেহায়েত কম দূর নয়! যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে। সুতরাং এক মুহূর্তও আর দেরি নয়—ধুলো উড়িয়ে মাইকেলের ঘোড়া ছুটে চললো কলিভানের উদ্দেশ্যে।

রাত নেমেছে। দিনের বেলাকার ভ্যাপসা গরম এখন আর ততোটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ জোরেশোরেই বাতাস বইছে। পরিষ্কার আকাশ। কিছুক্ষণ আগে চাঁদ উঠেছে। একঝাঁক তারাও ঝিকমিক করে আলো ছড়াচ্ছে। চাঁদের আলোয় পথঘাট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাই ঘোড়াও ছুটছে বেশ জোর গতিতেই—যদিও এতোটা পথ পেরিয়ে আসতে গিয়ে বেচারা স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্লান্ত।

আর মাত্র তিন ভার্স্ট; তারপরেই মাইকেল পৌঁছে যাবে ওবীর তীরে। কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই আর এগুতে চাইছে না। মনে হচ্ছে, এই বুঝি হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। একটু বিশ্রাম না দিলেই নয়। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে একটা জংলামতো জায়গায় ঘোড়া থামালো মাইকেল। এই ফাঁকে নিজেরও বিশ্রাম নেয়া হবে। জায়গাটা জুড়েই ঝোপজঙ্গল, এছাড়া বড়বড় কিছু গাছপালাও দেখা যাচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধতে যাবে, ঠিক এমন সময় ঘোড়ার খটাখট খটাখট আওয়াজ শুনতে পেলো মাইকেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকালো সে।

একটু পরেই লকলকে আগুনের শিখা দেখা গেলো। জনাপঞ্চাশেক অশ্বারোহীর একটা দল। চেহারা দেখেই চিনতে পারলো মাইকেল—এরা দুর্ধর্ষ উজবেক যোদ্ধা। শরীরে এদের মঙ্গোলিয়ান রক্ত। মাঝারি কিন্তু মজবুত শরীর। চেহারায় একটা বন্য ভাব। দেখেই বোঝা যায়, নিষ্ঠুরতায় এদের জুড়ি মেলা ভার। প্রত্যেকেরই পরনে কোর্তা, কোমরে লাল রঙের বেল্ট; কাঁধে রঙিন রুমাল আর পায়ে হাইহিল বুট। কোমরে তলোয়ার কিংবা ভোজালি, কাঁধে রাইফেল। কারো কারো কাছে আবার রিভলভারও দেখা যাচ্ছে। এদের দশবারোজনের হাতে একটা করে মশাল—রাতের আঁধারে পথ চলতে যাতে অসুবিধা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। মশালের আলো দেখতে পেলে হিংস্র জীবজন্তুও কাছে ঘেঁষে না।

একটা বড় গাছের নিচে দলটা গোল হয়ে বসলো। ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরের একটা ঝোপের আড়ালে মাইকেল লুকিয়ে। কান খাড়া করে রয়েছে ও—দলটা শত্রু না মিত্র, আগে তা যাচাই করতে হবে। দলটা সরকারী ফৌজের অংশও হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে সে। কিন্তু ভাবচক্করে মনে হচ্ছে, এরা তাতার ফৌজেরই একটা অংশ।

গাছের নিচে আগুন জ্বেলে খানাপিনার আয়োজন করছে ওরা। একজন হঠাৎ বলে উঠলো, 'লোকটা হয়তো খুব বেশি এগিয়ে নেই। ওমস্ক থেকে ও পালিয়ে যাবার পরপরই তো আমরা রওনা হয়েছি।'

'লোকটা আসলেই ওমস্ক ছেড়ে এদিকে এসেছে কিনা কে জানে!

হয়তো সেখানেই কারো বাড়িতে লুকিয়ে আছে,' বললো আরেকজন।

'আমার তা মনে হয় না,' প্রথমজন বললো, 'জারের বার্তা নিয়ে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে যাচ্ছে লোকটা। ওমস্কে লুকিয়ে থাকলে তারই তো ক্ষতি!'

গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গিয়েছে মাইকেলের। সর্বনাশ! ও যে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে চলেছে এ খবরও ওদের জানা! ভাগ্যিস সরকারী বাহিনী মনে করে ওদের হাতে ধরা দেয়নি। এতক্ষণে তাহলে ওপারের টিকেট কাটা হয়ে যেতো ওর। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। —মনে মনে ভাবলো সে।

লোকগুলো কথা বলেই চলেছে। একজন মশালধারী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ঐ বুড়িটাই যে জারের সংবাদ বাহকের মা, একথা আইভান ওগারেফ জানলেন কেমন করে?'

'আইভান যে সে লোক নন। ঠিকই আন্দাজ করেছেন তিনি,' বললো প্রথমজন। 'বুড়ি এমনিতে যদি সবকিছু স্বীকার করে তো ভালো, নইলে পেট থেকে কি করে কথা বের করতে হয়, আইভান ওগারেফ তা ভালো করেই জানেন।'

'এমনও তো হতে পারে, লোকটা আসলেই বুড়ির ছেলে নয়।'

'আইভান কখনো বাজে সন্দেহ করেন না। এসব ব্যাপারে পাকা জহুরীর চোখ তার। তুমি দেখে নিও, বুড়িকে আচ্ছামতো কয়েক ঘা লাগালেই সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়বে।'

কলজেতে কে যেন ছুরি বসালো মাইকেলের। যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এ কি শুনলো সে? মা তাহলে তাতারদের হাতে বন্দী! কে জানে, এখনো বেঁচে আছে কিনা। বেঁচে

থাকলেও না জানি কি ভীষণ অত্যাচার চলছে তার উপর। অবশ্য কোনোই লাভ হবে না এতে—হাজার অত্যাচারেও মা মুখ খুলবে না। শেষে না পেরে তাতাররা হয়তো মেরেই ফেলবে তাকে। —এসব ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো মাইকেল।

বুড়ি মা তাতারদের হাতে বন্দী, অথচ কিছুই করতে পারছে না মাইকেল। এখন ওমস্কে ফিরে গিয়েও কোনো লাভ নেই। তাতারদের চোখে ধুলো দিয়ে মাকে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু একটা করতে না পারলে চিরদিনের জন্যে মাকে হারাবে সে। ভেবে ভেবে কোন কূল কিনারা পেলো না মাইকেল। দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। চোখের পানি মুছে নিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মনে মনে বললো: ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছায় এবং দয়ায় কর্তব্য থেকে এখনো এক পা'ও পিছু হটিনি—হটবোও না। মাকে রেখে গেলাম তোমার জিম্মায়।

উজবেকরা গালগল্প চালিয়েই যাচ্ছে। কে একজন বলে উঠলো, 'লোকটার মাথা যে এনে দিতে পারবে, তাকে মোটা পুরস্কার দেবেন আইভান।'

'এতে আমাদের কাজটা আরো সহজ হয়ে গেছে,' বললো অন্য একজন, 'ব্যাটাকে এখন খুঁজে বের করতে পারলেই ব্যস—গুড়ুম! সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা ফতে।'

উজবেকদের ঘোড়াগুলো ঘাস খেতে খেতে ঝোপটার একেবারে কাছে চলে এসেছে। ওগুলো মাইকেলের ঘোড়াটাকে দেখতে পেলে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসতে পারে। তখন দেখা দেবে আরেক বিপদ। ঘোড়াগুলোর ডাক শুনে উজবেকরা এদিকে এলেই ধরা পড়ে যাবে মাইকেল। আর দেরি করা যায় না। কেউ যাতে টের না পায়

www.boiRboi.blogspot.com

সেদিকে লক্ষ্য রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো সে। অবলা জন্তুটাও বোধকরি মনিবের বিপদ টের পেয়েছে। তাই একটুও শব্দ না করে ধীরে ধীরে জঙ্গলের শেষ মাথার দিকে এগুতে লাগলো ঘোড়াটা— আর একটু এগিয়ে গেলেই রাস্তা পাওয়া যাবে। কিন্তু কপাল মন্দ মাইকেলের। ঝোপঝাড় পেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি যেই পৌঁচেছে, অমনি চিঁহি চিঁহি শব্দে উজবেকদের ঘোড়াগুলো ডেকে উঠলো। মনে মনে প্রমাদ গুণলো মাইকেল। তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গতি দিলো বাড়িয়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ঘোড়াগুলোর ডাক শুনতে পেয়ে বন্দুক হাতে ছুটে এলো কয়েকজন উজবেক সেনা। অন্যান্যরাও দৌড়ে এলো পেছন পেছন। দলের পাণ্ডামতো লোকটা ইশারা করতেই যে যার ঘোড়ায় চড়ে বসলো। তারপর আঞ্চলিক ভাষায় মাইকেলের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করতে করতে ছুটিয়ে দিলো ঘোড়া।

ছুটছে মাইকেলের ঘোড়া। পেছন পেছন ধেয়ে আসছে উজবেক বাহিনী। প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়াটা ছুটে চলেছে। কিন্তু একটু একটু করে বেচারার দম ফুরিয়ে আসছে। তবু কোনো বাধাই আর মানছে না সে। এবড়ো-খেবড়ো পথ, উঁচুনিচু জলাভূমি কিংবা ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে অবলীলায় পার হয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা। অবলা জন্তু; কিন্তু বিপদ ঠিকই টের পেয়েছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই ওবী নদী। নদীর তীর পর্যন্ত কোনোমতে পৌঁছতে পারলেই হয়; ভালোয় ভালোয় একটা নৌকো পেয়ে গেলে এ যাত্রাও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মাইকেল আর উজবেক সেনাদের মধ্যেকার দূরত্ব একটু একটু করে কমে আসছে। নদীর তীরে পৌঁছতে এখনো খানিকটা পথ

www.boiRboi.blogspot.com

বাকি। কিন্তু ঘোড়াটার দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওবীর তীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা কে জানে! মাঝেমধ্যে উজবেকদের হুংকার শুনতে পাচ্ছে সে। এর মানে এখন আর খুব বেশি দূরে নেই ওরা।

'গুড়ুম!' রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে গুলি ছুঁড়লো একজন উজবেক সেনা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে মাইকেলের। গুলিটা তার গায়ে না লেগে জামার আস্তিন ঘেঁষে চলে গেলো। একজনের দেখা-দেখি দলের অনেকেই মাইকেলকে লক্ষ্য করে রাইফেল চালাতে লাগলো। কিন্তু রাতের অন্ধকার বাঁচিয়ে দিলো ওকে। তবু গুলি ছুঁড়েই চলেছে ওরা।

ওবী নদীর তীরে মাইকেল যখন পৌঁছলো, উজবেকদের সঙ্গে ওর দূরত্ব ততক্ষণে আরো কমে এসেছে। নষ্ট করার মতো এক মুহূর্ত সময়ও হাতে আর নেই। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেলো সে। কিন্তু একি! নদীতে ফেরি কিংবা নৌকোর চিহ্নমাত্রও নেই। এখন উপায়? এদিকে উজবেকরাও এসে পড়েছে প্রায়। ভাবনা চিন্তার সময় নেই হাতে। একবার ভাবলো, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সাঁতরে পার হতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু তাহলে ঘোড়াটাকে তীরেই রেখে যেতে হয়। এতে মন থেকে সায় পেলো না মাইকেল। উজবেকরা পৌঁছে যখন দেখবে ও নেই তখন ঘোড়াটাকেই রাগের মাথায় হয়তো মেরে ফেলবে। যে এতোটা পথ নানারকম বিপদ আপদ ডিঙিয়ে ওকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে তাকে কিছুতেই হিংস্র উজবেকদের হাতে ছেড়ে দিতে মন চাইলো না ওর। শেষ পর্যন্ত ঘোড়াসুদ্ধই নদীতে নেমে পড়লো। ততক্ষণে উজবেক সেনারাও নদীর তীর বরাবর পৌঁছে গিয়েছে। মাইকেলকে ঘোড়া-সুদ্ধ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু

করলো ওরা। প্রথম কয়েকটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগলো ঘোড়াটার পেটে। সাথে সাথে একটা খিঁচুনি তুলে পানিতে তলিয়ে গেলো ঘোড়াটা। বিপদ আঁচ করতে পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে আগেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো মাইকেল। নইলে উজবেকদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতো।

ডুব সাঁতারে অনেকটা এগিয়ে গেলো মাইকেল। আর একটু এগিয়ে গেলেই ওপারে পৌঁছে যাবে। দূর থেকে উজবেক সেনারা তখনো গুলি ছুঁড়ছে। জোরে হাত চালালো মাইকেল। একটু পরেই পৌঁছে গেলো তীরে। এক মুহূর্তও দেরি না করে সামনের দিকে দৌড়ে গেলো সে।

এতোটা পথ এখন হেঁটেই যেতে হবে মাইকেলকে। প্রথমে কলিভানে যাবে। সেখান থেকে ইরকুটস্ক। একটা ঘোড়া পেলে খুব সুবিধে হতো ওর। কিন্তু আশপাশের গ্রামগুলো থেকে লোকজন ভেগে যাওয়ায় ঘোড়া কিংবা গাড়ি কোনোটাই পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এখন পায়ে হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বুকে সাহস সঞ্চয় করে জোরে পা চালালো মাইকেল।

কলিভান। শহরের সীমানায় মাত্র পৌঁচেছে মাইকেল, হঠাৎ লকলকে আগুনের শিখা নজরে পড়লো ওর। একটা গির্জায় আগুন জ্বলছে। এ নিশ্চয়ই তাতারদের কাজ। মনে মনে একটু অবাকই হলো সে। এতো তাড়াতাড়ি তাতাররা এখানে পৌঁছলো কিভাবে! মনে মনে সাবধান হয়ে গেলো। শহরে ঢুকে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে তাকে।

www.boiRboi.blogspot.com

পেটে খিদে, তার ওপর পথ চলার ক্লান্তি; পা যেন আর চলতে চায় না। হাঁটতে হাঁটতে শহরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে এলো মাইকেল। এর মধ্যে দুটো পোস্টিং হাউস দেখতে পেয়েছিলো সে, কিন্তু ঘোড়া কিংবা গাড়ি কোনোটাই মেলেনি। দূরে একটা পাকা বাড়ি নজরে পড়লো। চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর; বাড়িটা শহরের কোনো বাসিন্দার হলেই হয়। একটু খাবার আর পানি, সেইসঙ্গে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারলেই ব্যস; শরীরটা আবার আগের মতো চাঙা হয়ে উঠবে। বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে ভুল ভাঙলো ওর—ওটা কোনো বসতবাড়ি নয়, একটা সরকারি টেলিগ্রাম অফিস! ভীষণ দমে গেলো সে। ছোট একটা টুলের ওপর একজন কেরানি বসে; লোকটার পাশেই একটা টরেটক্কা মেশিন। বোঝা যাচ্ছে, লোকটার হাত দিয়েই সমস্ত খবরাখবর আসা যাওয়া করছে। যুদ্ধের টাটকা খবর পেতে হলে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে হবে। —মনে মনে ভাবলো মাইকেল। লোকটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'যুদ্ধের শেষ খবরাখবর কি; শুনলাম সব জায়গাতেই নাকি রাশিয়ান সেনারা তাতারদের হাতে মার খাচ্ছে?'

'হবে হয়তো,' নির্বিকার কণ্ঠ লোকটার।

ব্যাটা একটা আস্ত পাকা ঘুঘু। সবই জানে অথচ পেটে বোমা পড়লেও বেফাঁস কিছু বলবে না। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলো মাইকেল, 'সব জায়গাতেই কি খবর পাঠানো যাচ্ছে?'

'না। এখান থেকে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় খবর পাঠাতে পারবেন। প্রতি শব্দ দশ কোপেক।'

'সরকারি খবর পাঠানোর জন্যেও কি পয়সা দিতে হবে?'

'না; সরকারি পরিচয়পত্র দেখাতে পারলে কোনো পয়সা লাগবে

না।'

আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো মাইকেল, এমন সময় দুজন লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ঘরে। শত্রুপক্ষের লোক মনে করে চট্ করে দরজার আড়ালে লুকালো মাইকেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙলো—লোক দুজন শত্রুপক্ষের কেউ নয়। এদের একজন হ্যারি ব্লাউন্ট আর অন্যজন···অবশ্যই অ্যালসাইড জুলিভেট। ঘরে ঢুকেই কে কার আগে খবর পাঠাবে এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল কথা কাটা-কাটি শুরু হয়ে গেলো।

ইচিমের পর জুলিভেটদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো মাই-কেলের। ওদেরকে হঠাৎ এভাবে দেখতে পেয়ে খুশিই হলো সে; কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেলো না, ওরা এখানে এলো কোন্ পথে। মাইকেলকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে ওরাও কম অবাক হয়নি। কিন্তু দুজনের কারুরই ওর সঙ্গে কথা বলার ফুরসত নেই। দুজনেই ব্যস্ত খবর পাঠানো নিয়ে। শেষ পর্যন্ত হ্যারি ব্লাউন্টই যুদ্ধে জিতে গেলো—কেরানির হাতে একমুঠো রুবল গুঁজে দিলো সে। মেশিনের বোতাম টেপার আগে মুচকি হেসে কেরানি জানালো, প্রতি শব্দের জন্যে দশ কোপেক। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে কেরানিকে জলদি বোতাম টিপতে বললো ব্লাউন্ট। শুরু হলো খবর পাঠানো।

টরেটক্কা টরেটক্কা শব্দ করে চালু হলো মেশিন। ব্লাউন্ট মুখে বলছে আর লোকটা মেশিনের বোতাম টিপে চলেছে—খবর পৌঁছে যাচ্ছে জায়গামতো। প্রায় মিনিটখানেক বকবকানির পর চুপ করলো ব্লাউন্ট। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বোতাম টেপাও বন্ধ হয়ে গেলো। গোটা খবরটা একসঙ্গে করলে দাঁড়ায়:—

'ডেইলী টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড।'

'সাইবেরিয়া। ওমস্ক অঞ্চল। কলিভান। ৬ আগস্ট।'

'রাশিয়ান আর তাতার বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তুমুল লড়াই চলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি বাহিনী পরাজিত হচ্ছে। রাশিয়ান ফৌজের রক্তে ওমস্কের রাস্তাঘাট সয়লাব হয়ে গিয়েছে। তাতাররা আজ কলিভানে ঢুকেছে।'

ব্লাউন্ট থামতেই জুলিভেট এগিয়ে এসে বললো, 'দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান, এবারে আমার পালা।'

'কিন্তু এখনো তো খবর পাঠানো শেষ হয়নি আমার,' বলেই কেরানিকে ইশারা করলো সে। কেরানি মেশিনের সুইচ অন্ করতেই গর্‌গর্ করে বলে চললো ব্লাউন্ট:—"জন গিলপিন একজন নাগরিকের নাম···।"

পেটে পেটে ভীষণ চালাক এই হ্যারি ব্লাউন্ট। জুলিভেটকে দেরি করিয়ে দেয়াই ওর উদ্দেশ্য। তাই খবর পাঠানোর নাম করে, উই-লিয়াম কাউপারের কবিতা আউড়ে চলেছে সে। অবশ্য কেরানির এতে কোনো মাথা ব্যথা নেই—শব্দপিছু দশ কোপেক পেলেই হলো। ওদিকে জুলিভেট তো রেগে আগুন। এবারে আর কোনো বাধাই মানলো না সে; একটা কাগজে মোদ্দা খবরটা লিখে বাড়িয়ে দিলো কেরানির দিকে। কিন্তু কেরানি আর একটু চড়া স্বরেই বললো, 'ওঁর পালা এখনো শেষ হয়নি; দয়া করে লাইনে দাঁড়ান।'

কি আর করা! নিজের মনেই গজর গজর করতে লাগলো জুলি-ভেট। ওদিকে কাউপারের কবিতা···খুড়ি, খবর পাঠিয়েই চলেছে ব্লাউন্ট:—চারদিকে কেবল আগুন আর আগুন। দুটো বড় গির্জায় আগুন ধরেছে। "গিন্নীর ডাকে জন গিলপিন ফিরে এলেন···।"

জুলিভেটের ইচ্ছে হচ্ছিলো, ব্লাউন্টের নাক বরাবর একটা বিরাশি

www.boiRboi.blogspot.com

সিক্কা বসিয়ে দেয়। কিন্তু এ সময় ঝগড়া বিবাদ করা উচিত হবে না ভেবে মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রাখলো সে। ওদিকে ব্লাউন্টের খবর পাঠানো কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো জুলিভেটের। উঠে গিয়ে কেরানিকে আবার ফুস্‌লানোর চেষ্টা করলো —কিন্তু বেরসিক লোকটা এবারও তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'অতো অধৈর্য হচ্ছেন কেন! ওনার খবর পাঠানো শেষ হলে আমিই আপনাকে ডেকে পাঠাবো; ততক্ষণ ঐ টুলটায় বসে অপেক্ষা করুন,' বলে রুমের কোণার দিককার একটা টুলের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

ওদিকে ব্লাউন্ট নতুন আরেকটা খবর পাঠাচ্ছেন :—রাশিয়ান সেনারা যে যেভাবে পারছে পালিয়ে বাঁচছে। কলিভানের রাস্তাঘাট সরকারি সৈন্যদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। "...জন গিলপিন রওনা দিলেন...।" ব্যস, ব্লাউন্টের খবর পাঠানো শেষ। এবারে জুলিভেট উঠে গিয়ে কেরানির হাতে তার কাগজটা গুঁজে দিলো। কেরানি কাগজে লেখা ঠিকানাটা শেষ করে যেই খবর পাঠাতে আরম্ভ করেছে, অমনি প্রচণ্ড শব্দ করে টেলিগ্রাফ অফিসের ভেতরে একটা গোলা এসে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেলো। দেয়ালের কিছুটা অংশ নিয়ে ধসে পড়লো মজবুত ছাদের আধখানা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে ওদের; কারো গায়ে আঁচড়টিও লাগলো না। ওদিকে জুলিভেট ব্যস্ত খবর পাঠানো নিয়ে; কেরানিকে কেবলই তাড়া দিচ্ছে সে। কামানের গোলায় ছাদ ধসে মাথায় পড়ার জোগাড়, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই তার।

কাগজে লেখা খবরটা পাঠানো শেষ হয়েছে। এবারে একটা ফরাসী গানের কলি সুর করে গাইতে লাগলো জুলিভেট। কেরানিও তাল মিলিয়ে টিপে চললো বোতাম। হ্যারি ব্লাউন্টকে বিদ্রূপ করেই

www.boiRboi.blogspot.com

যে গানটা গাওয়া হচ্ছে তা বুঝতে আর বাকি রইলো না মাইকেলের। 'কি ব্যাপার! কোনো সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো ব্লাউন্ট।

'হ্যাঁ; আপনার কবিতার মতোই সাংকেতিক ভাষা এটা—আর খরচও অনেক কম!' ভুরু নাচিয়ে উত্তর দিলো জুলিভেট।

প্রচণ্ড শব্দ করে ধারেকাছেই আরো একটা গোলা ফাটলো। কেঁপে উঠলো টেলিগ্রাফ ভবন। জুলিভেটের সেদিকে খেয়াল নেই। একটানা খবর পাঠিয়েই চলেছে সে :—একটু আগে টেলিগ্রাফ ভবনে একটা গোলা বিস্ফোরিত হয়েছে। প্রায় গোটা শহরটাই এখন তাতার বাহিনীর দখলে...।

পুরো খবরটা শেষ হলো না; এর আগেই জানালা দিয়ে এক ঝাঁক গুলি এসে লাগলো দেয়ালে। ব্লাউন্ট জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। একটা গুলি এসে তার কাঁধের খানিকটা মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে। ওদিকে নতুন খবর আউড়ে চলেছে জুলিভেট :—ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা মিঃ হ্যারি ব্লাউন্ট এইমাত্র তাতারদের গুলিতে আহত হলেন। টেলিগ্রাফ ভবন লক্ষ্য করে তাতার সেনারা গুলি ছুঁড়ছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো কেরানি। মুচকি হেসে বললো, 'এইমাত্র লাইন কেটে গেলো, স্যার,' তারপর পাশে রাখা টুপিটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

এমন সময় দুপ্‌দাপ্‌ পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। কারা যেন এদিকেই আসছে। ব্লাউন্ট ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সদর দরজা দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলো জুলিভেট। খবর পাঠানোর সময় একজন আরেকজনের শত্রু হলেও বিপদে দুজনেই হাতে

হাত মিলিয়ে চলতে জানে। দৌড়ে বেশিদূর এগুতে পারলো না ; তার আগেই তাতার বাহিনীর হাতে বন্দী হলো ওরা। দূর থেকে সবকিছুই দেখলো মাইকেল। তাই সদর দরজা দিয়ে বেরুলো না সে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে। আর পড়বি তো পড় একেবারে তরতাজা এক ঘোড়ার পিঠের ওপর। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো মাইকেল। পাশেই ঘোড়ার মালিক দাঁড়িয়ে। ঘোড়া যখন পাওয়া গিয়েছে তখন আর চিন্তা কি। ঘোড়ার মালিককে মোটা দর হাঁকালেই কেল্লা ফতে। ইরকুটস্কে পৌঁছনো তখন পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। —মনে মনে ভাবলো সে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভুল ভাঙলো তার।

ঘোড়াটা তাতার বাহিনীর ; আর ঘোড়ার মালিক একজন তাতার সেনা। ব্যাপারটা যখন মাইকেল বুঝতে পারলো তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। চারদিক থেকে তাতার সেনারা ঘিরে ধরেছে ওকে।

দশ

কলিভান থেকে কয়েক ভার্স্ট দূরে বিরাট একটা মাঠে তাঁবু গেড়েছে ফিওফার খান। হাজার হাজার বন্দী আর সৈন্য সামন্তের ভিড়ে মাঠটাকে জনবসতি বলে ভুল হয়। মাইকেল, জুলিভেট আর ব্লাউন্টকে এখানকার বন্দী শিবিরে আনা হয়েছে ৭ আগস্ট। যে দলটা মাই-

www.boiRboi.blogspot.com

কেলকে ধরে এনেছে তারা এখনো ওর আসল পরিচয় জানে না। এতে বরং সুবিধাই হয়েছে ওর। সাধারণ বন্দীদের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে। খুব শিগগিরই আইভান ওগারেফ আর তার দলবল এসে যোগ দেবে ফিওফার খানের সঙ্গে ; তারপর একসঙ্গে ইরকুটস্কে আক্রমণ চালাবে।

একটা কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লো মাইকেল। আইভান ওগারেফ যে সমস্ত বন্দীদের সঙ্গে করে নিয়ে আসছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই ওর মা'ও রয়েছে। যদি মা আর ছেলেতে আবার দেখাদেখি হয়ে যায় তাহলেই বিপদ। ওকে দেখতে পেয়ে বুড়ি মা কি কাণ্ড করে বসে কে জানে।

বিরাট মাঠটা জুড়ে কেবলই তাঁবু আর তাঁবু। ফিওফার খানের এই তাঁবু শহরে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছে প্রায় লাখ খানেক সৈন্য। এখন আইভান ওগারেফ এসে পড়লেই ব্যস ; দুজন একসঙ্গে ইরকুটস্কে অভিযান চালিয়ে গ্রাণ্ড ডিউককে দিশেহারা করে ফেলবে।

ফিওফার খানের তাঁবু শহর সত্যিই দেখবার মতো। সমস্ত মাঠ জুড়ে কয়েকশো তাঁবু। সৈন্যসামন্ত আর বন্দী ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য দাসদাসী। এছাড়া ফুট ফরমাইশ খাটার লোকেরও অভাব নেই। প্রায় প্রত্যেকটা তাঁবুর চূড়োয় লাল নীল পতাকা উড়ছে। মাঠের এক কোণায় ভাঁজ করে রাখা গোটা পঞ্চাশেক তাঁবু। আইভানের বাহিনী এসে পড়লেই ওগুলো খাটানো হবে।

সৈন্যসামন্তদের একেকজনের পরনে একেক ধরনের পোশাক। কারো পরনে নীল কিংবা কালো রঙের জোব্বা। কেউবা পরেছে টকটকে লাল কোর্তা, সেই সঙ্গে মাথায় শোভা পাচ্ছে বাহারি

পাগড়ি। কারো কারো পরনে চামড়ার পোশাক ; এমন কি গাছের বাকলও পরেছে কেউ কেউ। এদের কারো কারো কোমরে তরবারি ঝুলছে। কেউ বা কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কারো কারো হাতে বর্শা কিংবা বল্লমও দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ভারি গোলন্দাজ বাহিনী তো আছেই।

মাঠের ঠিক মাঝাখানটায় ফিওফার খানের তাঁবু। তাঁবুর চূড়োয় সিল্কের পতাকা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। প্রবেশ পথে সোনালী ঝালর টাঙানো ; দুপাশে সোনালী দড়ি। দড়ির সঙ্গে সোনার তৈরি ঝুমকো ; মৃদু বাতাসের দোলায় চারদিকে রিনিঠিনি আওয়াজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁবুর মাঝখানে দামী পাথরের তৈরি কালো একটা টেবিল। টেবিলের ওপর সোনার বাক্সে ঢাকা একখানা কোরআন শরীফ। তাঁবুর আরো একটু ভেতরের দিকে আমীর ফিওফার খানের অস্থায়ী দরবার। বহু মূল্যবান মণিমুক্তো দিয়ে মোড়া আমীরের সিংহাসন। সিংহাসনের দু'পাশে দেহরক্ষীর দল। এদের একপাশে মন্ত্রী পরিষদ আর অন্যপাশে রাজ জ্যোতিষদের বসবার আসন। এছাড়া আরো একদল লোক দরবারে ঠাঁই পেয়েছে। এদেরকে বলা হয় উলেমা। ধর্মের বিধান মোতাবেক এরা বিচার-আচার চালিয়ে থাকে।

হঠাৎ খটাখট খটাখট শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একটা দুটো নয়, কয়েকশো। দেখতে দেখতে বিরাট মাঠটায় এসে জড়ো হলো কয়েকশো ঘোড়া। ঘোড়সওয়ারদের প্রায় প্রত্যেকেরই কাঁধে বন্দুক। এদের কেউ তাতার, কেউ বা উজবেক। কয়েকজন বিদ্রোহী কশাক সেনাও এই দলে রয়েছে। বিরাট এই দলটার নেতা যে আইভান ওগারেফ তা বুঝতে আর বাকি রইলো না কারো।

www.boiRboi.blogspot.com

ঘোড়া থেকে নেমে ফিওফার খানের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলো আইভান। ওকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে যেন আগে থেকেই তৈরি ছিলো ফিওফার খান। আইভানকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে এগিয়ে গেলো সে। কাছে গিয়ে দুগালে চুমু খেলো ওর তারপর নিজের সিংহাসনের পাশেই একটা আসনে ওকে বসতে বললো।

ফিওফার খানের মন্ত্রী পরিষদকে পাত্তাই দিলো না আইভান—তার ভাব ভঙ্গিমায় মনে হচ্ছে বুঝি সে'ই প্রধানমন্ত্রী। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলো সে। তারপর ফিওফার খানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'এবারে কোন্‌ দিকে অভিযান চালাবো, হুজুর ?'

'যেদিকে মন চায় সেদিকেই অভিযান চালাও, আইভান। তোমার বিচার বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে আমার।'

'ইরকুটস্কের দিকেই অভিযান চালানো যাক। জারের ভাই, গ্র্যাণ্ড ডিউককে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'বেশ, তাহলে ইরকুটস্কের দিকেই রওনা হয়ে যাও। গোটা সেনাবাহিনীকে এখন থেকে তুমি হুকুম করবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আমার সঙ্গে পরামর্শের কোনো দরকার নেই।'

আইভান ওগারেফের ওপর ফিওফার খানের আস্থাটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা মনে মনে গজর গজর করতে লাগলো ; কিন্তু মুখে কেউ টুঁ শব্দটিও করতে সাহস পেলো না।

ওদিকে বন্দীদের অবস্থা বড্ড করুণ। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে একেকজনের অবস্থা রীতিমতো কাহিল। তার ওপর মাইলের পর মাইল টেনে হিঁচড়ে সবাইকে এই তাঁবু শহরে জড়ো করা হয়েছে। অনেক বন্দীই পথ চলার ধকল সইতে না পেরে মারা গিয়েছে।

বন্দীদের কপাল ভালো বলতে হবে—একবারের জন্যেও তাঁবু ছেড়ে বাইরে বের হয়নি ফিওফার খান। নইলে এতক্ষণে বহু বন্দীকেই বিনা বিচারে কোতল করা হতো। আইভান ওগারেফের সঙ্গেও কয়েক হাজার বন্দীকে ধরে আনা হয়েছে। সঙ্গে আরো এসেছে একদল জিপসী—সাথে রয়েছে স্তাভারে নামের সেই মেয়ে জিপসীটা।

অ্যালসাইড জুলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট আবার দোস্ত বনে গিয়েছে। দু'জনেই ফিকির করছে প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে পালিয়ে বাঁচা যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। সুযোগ বুঝে একসঙ্গে চম্পট দিলো দুজন। কিন্তু কপাল মন্দ। প্রহরীরা সজাগ ছিলো। ওরা দুজন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতেই গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুক গর্জে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে দুজনেই মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলো। দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দুজনকে নিয়ে আসা হলো একজন অফিসারের কাছে। প্রহরীদের মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা শুনলো সেই অফিসার। ভীষণ রেগে গেলো সে। জল্লাদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। অফিসারের ইশারা পেয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে সাংবাদিক দুজনের কাছে এসে দাঁড়ালো সে।

গুলিগোলা আর হৈ চৈ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলো আইভান। দেখলো, দুজন বিদেশীকে কোতল করার জন্যে তরবারি তুলেছে জল্লাদ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জল্লাদকে নিষেধ করলো সে। আর একটু দেরি হলেই দুজনের মুণ্ডু ধড় হতে আলাদা হয়ে যেতো। সাংবাদিক দুজনকে জিজ্ঞেস করলো আইভান, 'আপনারা কে, আর এই বন্দী শিবিরেই বা এলেন কিভাবে?'

দুজনেই নিজেদের পরিচয়পত্র বের করে আইভানের দিকে এগিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দিলো; তারপর দুজনের হয়ে জুলিভেট বললো, 'কলিভান থেকে আমাদের ধরে আনা হয়েছে। পেশায় আমরা সাংবাদিক। খবরাখবর জোগাড় করাই আমাদের কাজ; অথচ কি অপরাধে এই শিবিরে বন্দী হয়ে এলাম তা কেউই বলছে না। বরং জিজ্ঞেস করলেই নানা-রকম লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে।'

পরিচয়পত্র দুটো উল্টেপাল্টে দেখলো আইভান। বললো, 'ঠিক আছে; আপনাদের দুজনকে মুক্তি দেয়া হলো। ইচ্ছে হলে আমাদের সেনাবাহিনীর সংগে যেতে পারেন কিংবা নিজেদের খুশিমতো যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন।'

'আপনার সেনাবাহিনীর সংগে যেতে আপত্তি নেই; কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই,' এবারে উত্তর দিলো ব্লাউন্ট।

'বেশ। এখন থেকে আপনারা স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম করবেন। আর হ্যাঁ, আমাদের বিজয়ের খবরাখবর যাতে ঠিকমতো আপনাদের পত্রিকায় ছাপা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন,' বলে আবার তাঁবুর ভেতরে ঢুকলো আইভান।

ওদিকে মাইকেলের মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। ও ভাবছে প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সটকে পড়া যায়। কিন্তু পালানো কি অতোই সহজ! জুলিভেট আর ব্লাউন্ট বিদেশী বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছে নইলে এতক্ষণে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যেতো ওদের।

শেষ পর্যন্ত পালানোর চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো মাই-কেল। এখন পালাতে গেলে পথে আবার ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর চাইতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্দী হিসেবে যাওয়াই সবচাইতে নিরাপদ। ফিওফার খানের বাহিনী ইরকুটস্ক দখলের

আগে টমস্ক শহরে অভিযান চালাবে। ঠিক তখনি সুযোগমতো সটকে পড়বে মাইকেল।

আইভানের বাহিনীর সঙ্গে অনেক বন্দীও এসেছে। এর মধ্যে একজন বৃদ্ধা আর একজন মেয়েও রয়েছে। দেখে মনে হতে পারে মা আর মেয়ে—অথচ এদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধা হাঁটতে গিয়ে এক আধবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো। মেয়েটা যত্নের সঙ্গে তাকে মাটি থেকে তুলে ক্ষতস্থান মালিশ করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, বৃদ্ধাকে দেখাশোনা করার সমস্ত দায়িত্বই বুঝি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। বৃদ্ধার নাম মার্ফা স্ট্রগফ আর সঙ্গের মেয়েটা নাদিয়া।

তাঁবু শহর ছেড়ে টমস্কের পথে যেতে যেতে পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হলো দুজনের। মার্ফা আর নাদিয়াকে দেখে এখন যে কেউই আপন মা আর মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। আলাপ হচ্ছিলো মা আর মেয়েতে। 'জানো মা, পার্ম থেকে রওনা দিয়েছিলাম একলা। বাবার কাছে যাবো বলে। রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না ; তবুও সাহস করে রওনা দিলাম। পথে পরিচয় হলো এক লোকের সংগে। তার সাথে ওমস্ক পর্যন্ত এসে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো,' মুখে কথার খৈ ফুটছে নাদিয়ার, 'না, ইচ্ছে করে নয়। ইরতিশ নদী পার হচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ তাতাররা আমাদের নৌকো আক্রমণ করে ডুবিয়ে দিলো। লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। আমি পানিতে ঝাঁপ দেবার আগেই একজন খপ্ করে ধরে ফেললো আমায়। জোর করে উঠিয়ে নিলো ওদের নৌকোয়। সেই যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো, আজ পর্যন্ত কোনো খোঁজ নেই তার। অবশ্য আমি নিজেই তো এখন বন্দী,' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো নাদিয়া, 'জানি না, আদৌ সে

www.boiRboi.blogspot.com

বেঁচে আছে কিনা। কি যেন এক জরুরী কাজে সাইবেরিয়ায় যাচ্ছিলো সে। কাজটা যে কি, তা আমায় বলেনি। তবে কথাবার্তায় যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও হ্যাঁ, লোকটার নাম নিকোলাস কোর্পানফ···।'

'কি! কি বললি, লোকটার নাম নিকোলাস কোর্পানফ?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো মার্ফা।

'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?'

'আরে বোকা, ও'ই তো আমার ছেলে। দেখা হয়েছিলো আমার সংগেও। চিনেও না চেনার ভান করলো। তখনই বুঝেছিলাম, নিশ্চয়ই এমন কোনো জরুরী কাজের ভার চেপেছে যার জন্যে নিজের মাকে পর্যন্ত না চেনার ভান করতে হচ্ছে। নিকোলাস কোর্পানফ কিন্তু ওর ছদ্মনাম। আসল নাম মাইকেল—মাইকেল স্ট্রগফ।'

'ওর জন্যে দোয়া কোরো মা ; যাতে সুস্থ শরীরে আপনজনদের মাঝে ফিরে আসতে পারে।'

নাদিয়ার কথায় হাসির ঝিলিক খেলে গেলো বুড়ি মার্ফার চোখে-মুখে।

বুনো জীব জানোয়ারকে যেভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক তেমনিভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দীদের। কারো একবিন্দু বিশ্রাম নেবার সুযোগ নেই। বন্দীদের পেছন পেছন ধেয়ে আসছে অশ্বারোহী সেনাদল। কেউ মুহূর্তের জন্যে হাঁটা বন্ধ করলেই ব্যস, ঘোড়ার লাথি খেয়ে এদিক সেদিক ছিটকে পড়ছে একেকজন। এছাড়া উপরি পাওনা হিসেবে বর্শা আর বল্লমের খোঁচা তো আছেই। বাচ্চা আর বুড়োদেরই বিপদ সবচাইতে বেশি। ঘোড়ার লাথি খেয়ে একেকজনের

কি দশা হচ্ছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। বন্দীরা মনে মনে ফুঁসছে কিন্তু ভয়ে কেউই প্রতিবাদ জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

১৫ আগস্ট সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে ফিওফার খানের বাহিনী এসে থামলো টম নদীর তীরে। রাতটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করলো। তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলো সে। বন্দীদের খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হবে। এতে বুড়োদের অনেকেই হয়তো মারা পড়বে কিন্তু করার কিছুই নেই। বন্দীদের মধ্যে কার এতো সাহস যে ফিওফার খানের হুকুমকে অমান্য করে?

তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ। ততক্ষণে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। তবে চাঁদের আলো থাকায় লোকজনের হাঁটাচলা করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বন্দীদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে মাইকেল। শোবার জন্যে সুবিধামতো জায়গা খুঁজছে। অন্ধকারের মধ্যে খালি জায়গা হাতড়ে মরছে। যেখানে মনে হচ্ছে খালি জায়গা, কিন্তু শুতে গিয়েই অন্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে—এর আগেই কেউ হয়তো শুয়ে পড়েছে সেখানে। শোবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। একটু দূরেই বুড়ি মা মার্ফা আর নাদিয়া দাঁড়িয়ে। ওরাও শোবার জায়গা খুঁজছে। সবকিছু ভুলে গিয়ে ওদের কাছে ছুটে যাচ্ছিলো মাইকেল; মুখ ফস্‌কে একবার মা বলে চেঁচিয়েও উঠলো সে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার সামলে নিলো নিজেকে। মা'র সঙ্গে এখন কথা বলার অর্থ হচ্ছে নিজের আসল পরিচয় শত্রু-পক্ষের কাছে প্রকাশ করে দেয়া। মার্ফা আর নাদিয়াও দেখতে পেয়েছে ওকে। কিন্তু না চেনার ভান করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো দুজনেই। এতে বরং খুশিই হলো মাইকেল; সে যে গুরুত্ব-

www.boiRboi.blogspot.com

পূর্ণ কোনো দায়িত্ব বয়ে নিয়ে চলেছে ওরা তা ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছে। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করে ওদের পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগুলো মাইকেল। কিন্তু সে জানলোও না, দূর থেকে একটা মেয়েলোক মার্ফার ওপর একটানা নজর রেখে চলেছে। মার্ফা আর নাদিয়াকে দেখে মাইকেলের চমকে ওঠাও নজর এড়ালো না তার। সে ঠিকই বুঝলো, ওদের দুজনের সঙ্গে মাইকেলের নিশ্চয়ই জানাশোনা রয়েছে—কিন্তু যখন লক্ষ্য করলো, দুজনকে না চেনার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে মাইকেল, তখন অবাক না হয়ে পারলো না সে। সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো তার মনে। চিনেও না চেনার ভান করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে—মনে মনে ভাবলো সে। মাইকেলরা একটু দূরে চলে যেতে সে'ও হন্ হন্ করে হাঁটা ধরলো আইভান ওগারেফের ডেরার দিকে। মেয়েলোকটা অন্য কেউ নয়—জিপসী স্যাঙারে!

স্যাঙারেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো আইভান, 'কি ব্যাপার! এতো হন্তদন্ত হয়ে কোত্থেকে এলে?'

'খবর আছে। গরম খবর,' বলে একটু আগের সেই ঘটনাটা আইভানের কাছে খুলে বললো স্যাঙারে।

সবকিছু শুনে গম্ভীর হয়ে গেলো আইভান। বললো, 'তুমি লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'না। অন্ধকারে চেহারাটা ভালো করে নজরে পড়েনি। কিন্তু আমার ভীষণ সন্দেহ হচ্ছে—ঐ লোকটাই মার্ফার ছেলে।'

'বুঝলাম; কিন্তু হাজার হাজার বন্দীদের ভেতর থেকে লোক-টাকে চিনে বের করাও তো মুশকিল।'

'এতে মুশকিলটা আবার কোথায়। আমাদের কিছুই করতে হবে না। বুড়িই লোকটাকে চিনিয়ে দেবে। বন্দীদের একসঙ্গে জড়ো করে বুড়ির পিঠে নাউটের বাড়ি লাগালেই কাজ হাসিল। মায়ের ওপর অত্যাচার চলতে দেখলে ছেলে নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। মাকে বাঁচানোর জন্যে একটা কিছু করতে চাইবে সে; কিংবা বুড়ি নিজেও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ছেলেকে চিনিয়ে দিতে পারে।'

'ঠিক আছে। বুড়িকে চোখে চোখে রাখো। গভীর রাতে মা আর ছেলেতে দেখা হওয়াটা অসম্ভব নয়। যদি তাই হয় তো সুযোগটা হাতছাড়া করো না—যেভাবেই হোক চেহারাটা চিনে রাখবে।'

আইভানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো স্যাঙারে। সারারাত সে নজর রাখলো বুড়ির ওপর। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নজর রাখা তা শেষ অব্দি ফললো না।

১৬ আগস্ট ভোরবেলা। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ফিওফার খান তার সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দিলো টমস্কের পথে। এর খানিকক্ষণ পর বন্দীশিবিরে এসে হাজির হলো আইভান। বন্দীদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতে হুকুম দিলো সে। এদের ভেতর থেকে মার্ফাকে টেনে বের করে আইভানের সামনে হাজির করা হলো। আইভানের পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু তদারকি করছে স্যাঙারে। মার্ফার পেট থেকে কথা বের করার ব্যাপারে ওর উৎসাহই যেন সবচাইতে বেশি।

'শোন্ বুড়ি, যদি ভালোয় ভালোয় সত্যি কথা না বলিস তো কপালে দুর্ভোগ আছে তোর,' গর্জে উঠলো আইভান, 'ঠিক করে

বল্, ওমস্কে যার সংগে দেখা হয়েছিলো সে কে?'

'এর আগে কোনোদিন তাকে দেখিনি, হুজুর। লোকটার চেহারা অনেকটা আমার ছেলের মতো। তাই ভুল করে ওকেই ছেলের নাম ধরে ডাকছিলাম।'

'ওসব চালাকি রাখ্। বন্দীদের মধ্যে থেকে ঐ লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে তোকে। আমি ভালো করেই জানি লোকটা কে; আর এ ও জানি, বন্দীদের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে আছে সে।'

'এতোদিন পরে লোকটাকে দেখলেও হয়তো চিনতে পারবো না, হুজুর।'

'চেহারা মনে করিয়ে দেয়ার ওষুধ জানা আছে আমার,' বলে ইশারা করতেই নাউট হাতে এগিয়ে এলো একজন।

বন্দীদের পেট থেকে কথা বের করার জন্যে মোক্ষম ওষুধ এই নাউট। নাউটের একশো ঘা কাউকে বরাদ্দ করলে বুঝতে হবে যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আশি ঘায়ের পর সাধারণতঃ কেউ বেঁচে থাকে না। কয়েকগাছি চামড়ার সঙ্গে লোহার তার পেঁচিয়ে তৈরি হয় নাউট।

মার্ফার সামনে দিয়ে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এর মধ্যে মাইকেলও ছিলো। কিন্তু না চেনার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো মার্ফা। একে একে সমস্ত বন্দীই বুড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে আবার আগের জায়গায় গোল হয়ে বসে পড়লো।

'জলদি বল, এদের মধ্যে কোন্ লোকটা তোর ছেলে?' হুংকার ছাড়লো আইভান।

'হুজুর, আপনাকে তো বলেইছি যে আমার ছেলে এখন কোথায় তা জানি না। আর যে লোকটাকে ছেলে বলে ভুল করেছিলাম সে-ও

www.boiRboi.blogspot.com

এখানে নেই,' তেজের সঙ্গে উত্তর দিলো মার্ফা।

'এখানে নেই, না? কি করে তাকে এখানে হাজির করতে হয় সে বিদ্যেও আমি জানি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো আইভান, 'এখনো সময় আছে, যদি নিজের ভালো চাস্ তাহলে লোকটাকে চিনিয়ে দে, নইলে কপালে খারাবি আছে তোর।'

'এখানে সে নেই, হুজুর!'

'তাই নাকি!' চোখেমুখে কৌতুক খেলে গেলো আইভানের। ইশারা করতেই আর একজন সিপাই সামনে এসে দাঁড়ালো। খাপ থেকে তরবারি বের করে মার্ফার বুক বরাবর উঁচিয়ে ধরলো সে—নাউটের ঘা খেয়ে বেসামাল হলেই তরবারির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। আর তাতেই কেল্লাফতে। বুড়িকে ঘটা করে আর মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে না।

বন্দীরা সবাই ফুঁসছে। মনে মনে রাগ পুষে রাখা ছাড়া করার আর কিছুই নেই ওদের। বাধা দিতে গেলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। তাই চোখমুখ বুজে পড়ে রইলো সবাই।

নাউট হাতে লোকটা মার্ফার পেছনে এসে দাঁড়ালো—আইভান হুকুম দিলেই সে তার কাজ শুরু করবে। নাউটটা শূন্যে কয়েকবার আছড়ে নিলো সে। একটু পরেই গর্জে উঠলো আইভান, 'লাগাও চাবুক।' আইভানের হুকুম শুনে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো স্যাঙারে।

চাবুকটা মার্ফার পিঠ স্পর্শ করার আগেই বন্দীদের মধ্যে থেকে ছুটে এলো একজন—তাতার সেনার হাত থেকে কেড়ে নিলো নাউটটা। কিন্তু বেশি বাহাদুরি ফলাবার সুযোগ পেলো না সে। অন্যান্য প্রহরীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। তারপর টেনে হিঁচড়ে

www.boiRboi.blogspot.com

হাজির করলো আইভানের সামনে। এতো টানা হেঁচড়ার মধ্যেও শক্ত হাতে সে ধরে রইলো চাবুকটা।

'তুমিই তাহলে মাইকেল স্ট্রগফ! এর আগে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?' আইভানের কণ্ঠে খানিকটা বিস্ময়।

'হ্যাঁ, আমিই মাইকেল স্ট্রগফ। এর আগে আমাদের মোলাকাত হয়েছিলো ইচিমের পোস্টিং হাউসে,' বলেই আইভানের গালে নাউটের এক ঘা লাগালো মাইকেল।

প্রহরীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো মাইকেলের ওপর। একজন খাপ থেকে তরবারি বের করতেই বাধা দিলো আইভান, 'এখন শুধু বন্দী করো ওকে। পেট থেকে সমস্ত খবরাখবর আগে বের করে নিই; তারপর কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবো ওর পাওনা।'

'বেশ করেছে। ইচিমের পোস্টিং হাউসের সেই অপমানের বদলা ভালোভাবেই নিয়েছে মাইকেল। যদি অন্য গালে আরেক ঘা লাগানোর সুযোগ পেতো তাহলে আরো খুশি হতাম আমি,' ব্লাউন্টের কানে ফিসফিসিয়ে বললো জুলিভেট। দুজনেই এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাজে সুবিধা হবে বলে বন্দীদের দলে ভিড়ে গিয়েছে ওরা।

আইভানের নির্দেশে দেহ তল্লাশী করা হলো মাইকেলের। বেরিয়ে পড়লো সেই চিঠিটা। খাম খুলে চিঠিটা বারকয়েক পড়লো আইভান। চেহারা আরো গম্ভীর হয়ে গেলো তার। আর দেরি না করে টমস্কের দিকে রওনা হবার আদেশ দিলো সে।

কথা হচ্ছিলো জুলিভেট আর ব্লাউন্টের মধ্যে। 'মাইকেলের জন্যে বড্ড দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'ওর মা আর নাদিয়াও রক্ষা পায় কিনা সন্দেহ,' জুলিভেটের কথার উত্তরে বললো ব্লাউন্ট।

'এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'আমাদের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। পথে সরকারি বাহিনীর কারো সংগে নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে। তখন সবকিছু খুলে বললেই চলবে। কিন্তু এখন কোনোরকম ঝুঁকি নেয়ার মানে হবে জেনেশুনে আত্মহত্যা করা।'

পথ চলতে লাগলো দুই সাংবাদিক। দুজনের মধ্যেই কেমন যেন একটা উসখুসে ভাব। চিঠিতে কি লেখা ছিলো তা জানার জন্যে দুজনেরই প্রাণ আইঢাই করছে।

এগারো

সাইবেরিয়ায় যে ক'টা বড় বড় শহর আছে তার মধ্যে টমস্কই সবচাইতে সুন্দর। তাতারদের আক্রমণে শহরটার যে কি দশা হয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের ছড়াছড়ি। দুর্গন্ধে টেকা দায়। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন বড় বড় পাথরের চাঁই।

মাত্র কয়েক ব্যাটেলিয়ন সরকারি সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করেও টমস্ককে রক্ষা করতে পারেনি। ফিওফার খানের বিরাট বাহিনীর কাছে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তারা। সরকারি ভবন এবং রাস্তাগুলোতে তাতার সৈন্যরা এখন টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ফিওফার খানের বাহিনীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে জোর আয়োজন চলছে। যে সমস্ত তাতার আগে থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে লুকিয়েছিলো এখন তারাই সবকিছুর খবরদারি করছে। শহরের একটা বাড়িঘরও আর আস্ত নেই। তাই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে বড় একটা মাঠে।

মাঠের ঠিক মাঝখানে ভোজবাজির মতোই গজিয়ে উঠেছে বড় একটা প্রাসাদ। দামী দামী পাথর আর মণিমুক্তোয় ঝল্‌মল্‌ করছে প্রাসাদটা। একদল তাতার সেনা প্রাসাদের চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিওফার খানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দাসদাসী আর ফুট-ফরমাইশ খাটার লোকজনও এসেছে। সংখ্যায় এরা নেহায়েত কম নয়। মাঠের একপাশে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে এরা। ফিওফার খান এখনো প্রাসাদে এসে পৌঁছয়নি; নইলে এতক্ষণে ঘাম ছুটে যেতো সবার। বন্দীদেরও তাড়িয়ে এনে জড়ো করা হচ্ছে এখানে।

প্রাসাদের হারেমে আজ সুন্দরীদের মেলা বসেছে। এদের বেশির ভাগই যুদ্ধবন্দী। এছাড়া কাউকে কাউকে আবার বোখারা কিংবা সমরখন্দ থেকে চড়া দামে কিনে আনা হয়েছে। ফিওফার খানের আদেশে এরা সবাই আজ অপরূপ সাজে সেজেছে।

যুদ্ধবন্দী কিংবা সেনাদল ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার নানাজাতের লোকজন এসে জড়ো হয়েছে মাঠে। এরা এসেছে তামাশা দেখতে। যুদ্ধবন্দীদের কিভাবে হেনস্তা করা হয় তা দেখার জন্যে এসব লোকজনের আগ্রহই যেন সবচাইতে বেশি। ক'দিন আগেও এই লোকগুলো ছিলো সরকারি বাহিনীর সমর্থক। আজ এদের ভোল পাল্টে গিয়েছে। টমস্কের আদি বাসিন্দারা উৎসবের ধারেকাছেও নেই। কেউ কেউ আগেই শহর ছেড়ে পালিয়েছে। যারা শহরে আছে

তাদের কেউই ঘর ছেড়ে বের হচ্ছে না।

বেলা চারটের মাঠে এসে হাজির হলো ফিওফার খান। পেছন পেছন এলো মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আর গণ্যমান্য লোকজন। হীরে দিয়ে সাজানো ফিওফার খানের ঘোড়াটা মাঠে ঢুকতেই প্রথামাফিক গর্জে উঠলো কামান। ঠিক তখনি প্রাসাদের ছাদে এসে দাঁড়ালো খান সাহেবের পয়লা নম্বরের বেগম। পরনে মণিমুক্তো বসানো দামী পোশাক। মুখের নেকাবটা সরিয়ে ফিওফার খানের দিকে চেয়ে হাত নাড়লো সে। তারপর চলে গেলো প্রাসাদের ভেতর। ঐটুকু সময়ের জন্যে যারা বেগমের চেহারা দেখতে পেয়েছিলো তারা সবাই মানতে বাধ্য হলো, সুন্দরী বাছাইয়ের ব্যাপারেও খান সাহেব কম যান না।

ঘোড়া থেকে নেমে মাঠের কোণার দিককার একটা তাঁবুর দিকে এগুলো ফিওফার খান। লম্বা সারি দিয়ে একদল উলেমা বসে রয়েছে সেখানে। সামনেই বড় একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে সোনার পাতে মোড়া একখানা কোরান শরীফ।

একটু পরে আইভানও তার দলবল নিয়ে হাজির হলো। গালের ক্ষতটায় পুঁজ জমে চেহারাটা আরো বীভৎস দেখাচ্ছে তার।

এবার শুরু হবে উৎসবের কাজকর্ম। প্রথমেই নাচ গান নয়—এর আগে বন্দীদের সবাইকে ফিওফার খানের কাছে মাথা হেঁট করে নতি স্বীকার করতে হবে।

বন্দীরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। কেউ একটু বেচাল হলেই ব্যস—সপাং সপাং চাবুকের বাড়ি পিঠে এসে পড়ছে। সবাই লম্বা লাইন করে দাঁড়ানোর পর শুরু হলো কুর্নিশ করার পালা। একেকজন বন্দী ফিওফার খানের সামনে এসে দাঁড়ায়, তারপর মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করতে করতে চলে যায় অন্যপাশে। এবারে এলো মার্কার

www.boiRboi.blogspot.com

পালা। ফিওফার খানকে কুর্নিশ করা তো দূরের কথা—বরং ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। কয়েকজন সিপাই জোর করে ঘাড় নুইয়ে দিতে গিয়ে বিফল হলো। এরপরে এলো মাইকেল। এলো বললে ভুল বলা হবে; একরকম জোর করেই খান সাহেবের সামনে হাজির করা হলো তাঁকে। মায়ের মতো সেও বুকটান করে দাঁড়িয়েই রইলো—মাথা নোয়ালো না। পেছন থেকে একজন তাতার বর্শার খোঁচা মেরে বললো, 'বাঁচতে চাইলে জলদি হুজুরকে কুর্নিশ কর।' ব্যস, আর যায় কোথায়! পেছন ঘুরে তাতারটার চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগালো মাইকেল। হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়লো বজ্জাতটা। কিন্তু অন্যান্য তাতার সেনারা ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে তাকে। গর্জে উঠলো আইভান, 'ফের বেয়াদবি করলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেবো।'

ফিওফার খান এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবারে মুখ খুললো সে, 'লোকটা কে?'

'বদমাইশটা রাশিয়ার গুপ্তচর, হুজুর,' উত্তর দিলো আইভান।

'রাশিয়ার গুপ্ত-চর!' কথাটা বারকয়েক চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলো খান সাহেব। তারপর একজনকে ইশারা করতেই সে কোরান শরীফখানা এনে হাজির করলো ফিওফার খানের সামনে। পেছন পেছন প্রধান উলেমাও এসে উপস্থিত হলো। কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে তা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে মাইকেল। মধ্য এশিয়ার প্রথামাফিক শাস্তি দেয়া হবে তাকে। এই প্রথাকে 'ফাল' বলে।

মাইকেলের সামনে কোরান শরীফ খুলে ধরা হলো; কোনো ঝামেলা না করে কোরানের পাতায় আঙুল রাখলো সে। যে জায়গায় ওর আঙুল গিয়ে ঠেকলো সেটুকু প্রথমে নিজে পড়ে নিয়ে

সবাইকে ব্যাখ্যা করে শোনালো প্রধান উলেমা : পৃথিবীর পবিত্র আলো তার চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এ দুনিয়ার কোনোকিছু দেখবার অধিকার তার নেই।

উলেমার বয়ান শেষ হতেই গর্জন করে উঠলো ফিওফার খান, 'রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরগিরি করার মজাটা টের পাবি এবার! সূর্য ডোবার আগে যা পারিস দেখে নে। আঁধার হবার সংগে সংগে তোর চোখের জ্যোতিও আর থাকবে না।'

ইঙ্গিতটা বুঝলো মাইকেল। সূর্য ডোবার পরপরই অন্ধ করে দেয়া হবে তাকে। ফিওফার খানের ঘোষণা শুনে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মার্ফা। মাইকেল কিন্তু এতোকিছুর পরেও একটুও দমলো না। ঠায় দাঁড়িয়েই রইলো। একজন সিপাই তাকে এক-পাশে টেনে নিয়ে গেলো। এবার শুরু হলো অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথমেই ইরানী মেয়েদের নাচ। ম্যাণ্ডোলিন, কুদিশ ফ্লুট আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নেচে চলেছে মেয়েরা। এদের মাথার ওপর উড়ছে ডজনখানেক ঘুড়ি। ঘুড়িগুলোর লেজের সঙ্গে ঝুমঝুমি বেঁধে দেয়ায় ওগুলো মৌমাছির মতো শব্দ করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। খানিকক্ষণ বিচিত্র ভঙ্গিমায় নর্তন-কুর্দনের পর শেষ হলো ইরানী মেয়েদের নাচ। এবারে শুরু হলো জিপসীদের নাচ।

ওদিকে প্রহরীরা তখন অন্য আয়োজনে ব্যস্ত। একটা তেপায়ার ওপর বিরাট একটা কড়া বোঝাই গনগনে কয়লার আগুন। কয়েকজন লোক চোঙা দিয়ে সেই আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। উত্তাপে ধারেকাছের মাটি গরম হয়ে উঠেছে। কড়ার ফুট তিনেকের মধ্যে পা রাখা যাচ্ছে না। লোকগুলো তবুও ফুঁ দিয়েই চলেছে; এতে কড়ার আগুন আরো তেতে উঠছে। এমন সময় একজন সিপাই একটা তলোয়ার

www.boiRboi.blogspot.com

এনে রাখলো কড়ার ওপর। আগুনের তাপে দেখতে দেখতে সেটা টকটকে লাল হয়ে উঠলো।

জিপসীদের নাচ ততক্ষণে বেশ জমে উঠেছে। এদের নাচ ইরানীদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ইরানী মেয়েদের নাচে যথেষ্ট সংযম ছিলো কিন্তু জিপসী মেয়েগুলো নাচের নামে কেবলই অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে। এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে স্যাণ্ডারে। নাচ যে রকমই হোক না কেন খান সাহেব থেকে শুরু করে সাধারণ সিপাই পর্যন্ত তা একমনে উপভোগ করছে। মাঝেমধ্যে মোহর ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ। এদিকে সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে চারদিক। তাই ঘুড়িগুলোকে নামিয়ে এনে লণ্ঠন জুড়ে দেয়া হলো। লাল নীল আলোর খেলায় সেগুলো মেতে উঠলো আকাশে।

জিপসীদের পর এবারে এলো সেনাবাহিনীর নাচিয়ে দল। এদের সবাই অবশ্য পুরুষ। যুদ্ধে এরা যেমন সুশৃঙ্খল, নাচেও তার কোনো কমতি দেখা গেলো না। নিজেদের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠলো জুলিভেট আর রাউন্ট। তাতার বাহিনীর সঙ্গেই টমস্কে এসেছে এরা। একটু পর সেনাবাহিনীর নাচও শেষ হলো। এবার শুরু হলো পটকা আর আতশবাজি পোড়ানোর খেলা। একেকটা আতশবাজি নানারকম রংয়ে জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে যায় আকাশে। কিছু লোক আবার ধুমসে পটকা ফোটাচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। এমন সময় মাইকেলের কানের কাছে কে যেন বলে উঠলো, 'শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নে।' পেছন ফিরে চাইলো সে। কড়ায় যে লোকটা তলোয়ার তাতাতে দিয়ে এসেছে তার মুখ দিয়েই কথাগুলো বের হয়েছে। এই লোকটাই বোধহয় জল্লাদ; আর

এর হাত দিয়েই তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করা হবে—ভাবলো মাইকেল।

সূর্য ডুবেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। প্রাসাদের চারদিকে আর তাঁবুগুলোর আশপাশে লণ্ঠন আর মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কয়লার আগুনে রাখা তলোয়ারটা তেতে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। একজন সিপাই মাইকেলকে খোলা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলো। কি ঘটতে চলেছে তা বুঝতে আর বাকি রইলো না কারো। জুলিভেট আর ব্লাউন্টও বুঝতে পারলো, কি ঘটতে যাচ্ছে। বিবেকের দংশন দুজনকেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে অথচ কেউ কিছু করতে পারছে না। 'এ দৃশ্য দেখাও পাপ ; চলুন আমরা রওনা দিই,' বলে ব্লাউন্টের হাত ধরে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এলো জুলিভেট। তারপর সোজা ইরকুটস্কের পথ ধরলো দু'জন।

জল্লাদ আগুন থেকে তলোয়ারটা তুলে আনলো। মাইকেলকে দাঁড় করানো হয়েছে কাঠের একটা পাটাতনের ওপর। এর একটু দূরেই ফিওফার খানের আসন। খান সাহেবের পাশেই বসে রয়েছে আইভান—চোখেমুখে তার পৈশাচিক উল্লাস খেলা করছে। এদের একটু দূরেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েছে মার্ফা। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মাকে কাঁদতে দেখে মাইকেলের চোখের পাতাও ভিজে উঠলো।

তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসছে জল্লাদ। মাইকেলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো সে। হাতের তলোয়ারটা উঠে গেলো ওর কপাল বরাবর। মাইকেলের দু'চোখ লক্ষ্য করে হঠাৎ তলোয়ারটা চেপে ধরলো সে। ভালো করে সেটা চেপে ধরার আগেই বিকট চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো মাইকেল। দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়ালো ও। এরপর

www.boiRboi.blogspot.com

যেই কয়েক পা এগিয়েছে অমনি কিসের সঙ্গে যেন হোঁচট খেয়ে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। ওকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখে হো হো করে হেসে উঠলো আইভান। এগিয়ে এসে পকেট থেকে জারের চিঠিটা বের করলো সে। সেটা মেলে ধরলো মাইকেলের সামনে। 'নে, পড়ে মুখস্থ কর ; নইলে গ্র্যাণ্ড ডিউকের কাছে খবরটা পৌঁছবি কি করে!' বিদ্রূপের সঙ্গে বলে উঠলো আইভান।

দলবল সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলো ফিওফার খান। এর একটু পরে আইভানও তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরকুটস্কের দিকে যাত্রা করলো। মদ খেয়ে তাতার সেনারা এতোই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো যে বন্দীদের সবাই তাদের সঙ্গে আছে কি নেই তা কেউই ভালো করে লক্ষ্য করলো না। এই সুযোগে অনেক বন্দী পালিয়ে গেলো। তাতারদের অনেকেই মাইকেলকে লক্ষ্য করলো কিন্তু ওকে বন্দী হিসেবে নেয়ার ব্যাপারে কারুরই আগ্রহ নেই। আগ্রহ না থাকারই কথা। একজন অন্ধকে বন্দী হিসেবে সঙ্গে নিতে গেলে বাড়তি ঝামেলা অনেক। তার চাইতে মরে গিয়ে শিয়াল কুকুরের খাবার হোক—তাতার সেনাদের অনেকেই মনে মনে এরকমটা ভাবলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেলো। মশাল আর লণ্ঠনগুলো আগেই নিবিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরো মাঠটাকে মনে হচ্ছে বিরাট একটা প্রেতপুরী। মাঠের এক কোণায় পথ হাতড়ে মরছে মাইকেল। এমন সময় নরম একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো সে। 'কে, নাদিয়া?'

'হ্যাঁ। মা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমার হাতটা শক্ত

করে ধরুন তাহলে হাঁটতে কোনো অসুবিধা হবে না।'

'কিন্তু তোমরা তাতারদের চোখকে ফাঁকি দিলে কি করে?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো মাইকেল।

'ওরা তখন মদ খেয়ে হল্লা করছিলো,' বললো নাদিয়া, 'সেই সুযোগে মাকে সাথে নিয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিলো আপনাকে ওরা হয়তো সঙ্গে নেবে না। আর হলোও তাই।'

মাইকেলকে আসতে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বুড়ির চোখমুখ। কাছে আসতেই ছেলের গলা জড়িয়ে ধরলো; তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে। মাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো মাইকেল। কিন্তু কিছুতেই কান্না থামলো না মার্ফার। মায়ের কপালে চুমু খেলো ও; তারপর কানে কানে কিছু কথা হলো মা আর ব্যাটায়। হঠাৎই চেহারাটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মার্ফার।

নাদিয়ার উদ্দেশ্যে বললো মাইকেল, 'এখন কি যে করি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। আমরা বরং ফিরেই যাই।'

'এতদূর এসে কিছুতেই ফিরে যাওয়া চলবে না। যেভাবেই হোক, দায়িত্বের বোঝা আপনাকে হালকা করতেই হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো নাদিয়া।

'কিন্তু আমি যে এখন অন্ধ।'

'তাতে কি হয়েছে! মা ওমস্কেই ফিরে যাক। আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো ইরকুটস্কে।'

'পথে কতোরকম বিপদ হতে পারে কে জানে। এছাড়া পয়সা-কড়িও যা ছিলো সবই তাতাররা লুটে নিয়েছে। পুরো পথটা হয়তো

www.boiRboi.blogspot.com

হেঁটেই যেতে হবে। এতো কষ্ট তুমি সইতে পারবে?'

'খুব পারবো। আর দেরি না করে চলুন, এবার রওনা দেয়া যাক।'

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হলো ইরকুটস্কের পথে।

রাতটা ধারেকাছেই কোথাও কাটিয়ে দিতে চাচ্ছিলো মাইকেল। কিন্তু নাদিয়া শুনলো না। বরং একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে চললো ওকে। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ইরকুটস্কের দিকে রওনা দিয়েছে। তাই একমুহূর্ত সময়ও বাজে নষ্ট করতে রাজি নয় নাদিয়া। হাতে সময় খুবই কম। শত্রু সেনারা পৌঁছবার আগেই গ্র্যাণ্ড ডিউককে যদি সাবধান করে না দেয়া যায় তাহলে গোটা সাইবেরিয়াই তাতারদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে।

পথ চলতে চলতে অনেক কথাই ভিড় করছে নাদিয়ার মনে। বেশি করে মনে পড়ছে নিজনি নভগরডের সেই পুলিশ স্টেশনের কথা। সেদিন মাইকেল সাহায্য না করলে এতদূর পর্যন্ত হয়তো আসা হতো না তার। বহু ঝড় ঝাপটা আর বিপদ আপদ মাথায় নিয়ে যে লোকটা সবসময় তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, আজ সে অন্ধ! নিজের অজান্তেই দুচোখ ভিজে উঠলো তার।

একটানা পঞ্চাশ ভার্স্ট পথ পাড়ি দিলো ওরা। পথচলার ধকলে দুজনেই বেজায় ক্লান্ত। একটু না জিরোলেই নয়। তাই পথের ধারেই বসে পড়লো দুজন। ভোরের আলো তখন একটু একটু করে উঁকি দিচ্ছে। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা ধরলো। পথে ছোট একটা শহর পড়লো। মানুষজনের চিহ্নমাত্রও নেই। তাতারদের

ভয়ে আগেভাগেই সবাই পালিয়ে গেছে। কাছেই একটা পাকা বাড়ি চোখে পড়লো নাদিয়ার ; বাড়ির ভেতরে ঢুকে খুঁজে পেতে কিছু খাবার জোগাড় করে আনলো। খাবার বলতে কেবল কয়েক টুকরো রুটি আর সামান্য একটু পনির। দুজনে তা'ই খুব তৃপ্তির সাথে খেলো।

আবার শুরু হলো পথ চলা। যেতে যেতে টুকরো-টাকরা কথা হচ্ছিলো দুজনের মাঝে। মাইকেল বললো, 'নাদিয়া, এখান থেকে ইরকুটস্ক এখনো অনেক দূরে। বরং এক কাজ করো। আমাকে এখানে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাও তুমি। আমার জন্যে মিছেই ঝামেলা হচ্ছে তোমার।'

'আমাকে কি তুমি এতোই স্বার্থপর ভাবো, মাইকেল ?'

'স্বার্থপরতার কোনো ব্যাপার নয় এটা। যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছিলাম তা পালন করার ক্ষমতা এখন আর আমার নেই। তাই বলছিলাম, আমাকে বরং এখানেই রেখে যাও। আমার জন্যে ভেবো না। ব্যবস্থা একটা হবেই।'

'ব্যবস্থা একটা হবেই, না ?' মাইকেলের কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো নাদিয়া। 'আমি যাবো বাবার সাথে দেখা করতে আর এদিকে পথ হাতড়ে মরবে তুমি, তাই না ? কি চমৎকার ব্যবস্থা,' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো নাদিয়া। কাঁদতে কাঁদতেই বললো, 'কিছুতেই একলা ফিরে যেতে দেবো না তোমাকে। যদি ফিরেই যেতে হয় তো দুজনেই একসঙ্গে যাবো।'

এক রাতের মধ্যেই কতো পাল্টে গিয়েছে নাদিয়া! নিজনি নভগরডের সেই মুখচোরা মেয়েটা পরপুরুষকে 'তুমি' করে বলতে শিখে গিয়েছে। অন্যের দায়িত্ব হাসিমুখে নিজের কাঁধে তুলে নিতেও শিখেছে সে। আর শিখেছে ভালোবাসা দিয়ে অন্যের হতাশাকে দূর

www.boiRboi.blogspot.com

করতে। মনে মনে হাসলো মাইকেল। কিন্তু মুখে বললো, 'ছিঃ। এভাবে কাঁদতে নেই। ঠিক আছে, এখন থেকে তোমার কথামতোই সবকিছু হবে। কি, খুশি ?'

দু'চোখের কান্না উবে গেলো নাদিয়ার। দৃষ্টিশক্তি থাকলে মাইকেল দেখতে পেতো, একজোড়া চোখ কৃতজ্ঞতা মাখা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। চোখেমুখে খুশির ফোয়ারা উপচে পড়ছে। ভেজা চোখজোড়া আবারো যেন ভিজে উঠেছে একটু।

পথ চলার কোনো শেষ নেই। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে আসে। তবুও হেঁটেই চলেছে দু'জন। ভার্স্টের পর ভার্স্ট পেরুচ্ছে—তবুও চলার কোনো বিরাম নেই। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মাইকেল, 'নাদিয়া, আমাদের পেছন পেছন কারা যেন আসছে।'

'কৈ, না তো ?' বললো নাদিয়া, 'ধারেকাছে কাউকেই তো দেখছি না।'

'ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাচ্ছি। কেউ হয়তো আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।'

মাইকেলের কথাই সত্যি। দূরে একটা ঘোড়ার গাড়িকে আসতে দেখা গেলো। গাড়ির চালক শত্রু নাকি মিত্র, তা জানার জন্যে মাইকেলকে সঙ্গে করে একটা গাছের আড়ালে লুকোলো নাদিয়া। চালকের আসনে বসা লোকটাকে দেখে আশ্বস্ত হলো সে। লোকটা তাতার নয় ; খাঁটি সাইবেরিয়ান। ঘোড়ায় টানা গাড়িটা একটা কিবিটকা। তারানতাস কিংবা বালিনের চেয়ে আকারে অনেক ছোট।

'কোথায় যাচ্ছেন, আপনারা ?' ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা। গলার আওয়াজে চমকে উঠলো মাইকেল। এই কণ্ঠস্বর এর আগেও কোথায় যেন শুনেছে সে।

'আমরা ইরকুটস্ক যাচ্ছি,' বললো নাদিয়া।

'সঙ্গে গাড়িঘোড়া কিছুই তো দেখছি না, হেঁটে হেঁটেই ইরকুটস্ক যাবেন নাকি?'

'এছাড়া কোনো উপায় নেই। তাতাররা আমাদের সবকিছু লুটে নিয়েছে। টাকা পয়সা সবকিছু খুইয়ে এখন পথের ভিখিরি আমরা,' বললো নাদিয়া। তারপর মাইকেলকে দেখিয়ে বললো, 'ও আমার আত্মীয়। তাতাররা ওকে জন্মের মতো অন্ধ করে দিয়েছে।'

'উঃ, কি সাংঘাতিক!' অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠলো লোকটা। বললো, 'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে দুঃখ করে কি ই বা লাভ, বলুন? এখন চলুন একসঙ্গে রওনা হওয়া যাক। একটু চাপাচাপি করে বসতে হবে এই যা অসুবিধে। কুকুরটা নাহয় হেঁটেই যাবে,' বলে শিস দিয়ে উঠলো লোকটা। কিবিটকার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মাঝারি আকারের একটা সাইবেরিয়ান কুকুর।

কিবিটকায় ঘোড়া লাগে মোট তিনটে। কিন্তু এটাকে মাত্র একটা ঘোড়ায় টেনে চলেছে। এখন বাড়তি দুজন চাপলে গাড়ির গতি অনেক কম হবে। নাদিয়া তাই একটু ওজর আপত্তি জানাচ্ছিলো; কিন্তু কোনো কথাই কানে তুললো না লোকটা। একরকম জোর করেই ওদের দুজনকে সে টেনে তুললো গাড়িতে।

'ওহ্ হো, এতক্ষণ নামটাই বলা হয়নি। আমার নাম নিকোলাস পিগাসফ। আর সঙ্গে যে কুকুরটা দেখছেন, ওর নাম সার্কো। আমার সারাক্ষণের সাথী—বেজায় প্রভুভক্ত,' ঘোড়ার পিঠে গাড়োয়ানি কায়দায় চাবুকের বাড়ি লাগালো লোকটা। বেশ জোরের সঙ্গেই চলতে শুরু করলো গাড়ি।

'আমি নাদিয়া আর ওর নাম মাইকেল,' নিজেদের পরিচয় দিলো

নাদিয়া।

'আপনাকে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে; কণ্ঠস্বরটা এর আগেও কোথায় যেন শুনেছি,' লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললো মাইকেল।

'হবে হয়তো। কলিভানে গিয়েছেন কখনো? সেখানকার টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতাম আমি। তাতারদের আক্রমণে অফিসটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

এবার মনে পড়েছে মাইকেলের, টেলিগ্রাফ অফিসের সেই কেরানি। চারদিকে যখন প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছিলো তখন সে টেলিগ্রাফে জুলিভেটদের খবরগুলো বাইরে পাঠাচ্ছিলো। এতো গোলাগুলির মধ্যেও ঠিক ঠিকই কাজ করে যাচ্ছিলো সে। 'আচ্ছা, তাতাররা যেদিন কলিভানে ঢুকলো সেদিন দুজন বিদেশী সাংবাদিক আপনার ওখান থেকে খবর পাঠাচ্ছিলো, মনে পড়ে?'

'উঁহুঁ; কতো লোকই তো খবর পাঠায়। আর সেসব মনে রাখলে আসল কাজ বাদ দিয়ে ডাইরি লেখা শুরু করতে হবে। আমার পয়লা নম্বরের কাজ খবর পাঠানো আর দ্বিতীয় কাজ খবর ভুলে যাওয়া।'

কথাবার্তায় কেমন যেন বেরসিক লোকটা! এতো খাতির করে গাড়িতে তোলার পেছনে কোনো কু মতলব আছে কিনা কে জানে!

গাড়ি চলছে তো চলছেই। মাঝেমধ্যে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে। তিনটের জায়গায় মাত্র একটা ঘোড়ায় টানছে গাড়িটা। বেকায়দায় পড়লে নাকি বাঘেও ঘাস খায়; ঘোড়াটারও হয়েছে সেই দশা। ছোলার বদলে মাইকেলদের খাবার থেকে অল্প অল্প করে দেয়া হচ্ছে বেচারাকে। খাবার এমনিতেই অল্প। ধারেকাছের দোকানগুলোয় তাতার সেনারা আগুন লাগিয়ে ছারখার করেছে।

২৫ আগস্ট মাইকেলরা ক্রানয়ার্স্ক শহরে পৌঁছলো। শহরে

www.boiRboi.blogspot.com

লোকজনের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলো না। তাতারদের ভয়ে লোকজন আগেভাগেই পালিয়ে গিয়েছে। এখান থেকেই সরকারি বাহিনীকে টমস্ক দখল করতে পাঠানো হয়েছিলো; কিন্তু ফিওফার খানের সেনাদলের সঙ্গে শক্তিতে পেরে ওঠেনি। শেষমেষ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলো তারা।

গোটা শহরটা ঘুরে দেখলো। কিন্তু লোকজনের ছায়াও চোখে পড়লো না ওদের। কপাল চাপড়াতে লাগলো নিকোলাস। বললো, 'এখন কি হবে! ভেবেছিলাম এখানে এলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই; কিন্তু এ যে দেখছি আস্ত এক প্রেতপুরী!'

'এক কাজ করুন, চলুন আমাদের সাথে ইরকুটস্ক পর্যন্ত। বড় শহর। সেখানে চাকরি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না আপনার।'

'এছাড়া আর উপায়ই বা কি! ছোটখাটো শহরগুলো সবই তো তাতারদের দখলে। গ্র্যাণ্ড ডিউকের আস্তানাই এখন একমাত্র ভরসা।'

২৬ তারিখ ভোরবেলা ওরা ইয়েনিসি নদীর তীরে পৌঁছলো। এবার দেখা দিলো আরেক সমস্যা। নদী পেরুনোর জন্যে ফেরি কিংবা নৌকো কিছুই নজরে পড়লো না ওদের। চোখমুখ শুকিয়ে গেলো নিকোলাসের। মুখে কোনো কথা জুটছে না তার। এখন উপায়! নদীটা প্রায় দেড় ভার্স্ট চওড়া। সাঁতরে হয়তো পেরুনো সম্ভব; কিন্তু গাড়িটাকে তাহলে আর সঙ্গে নেয়া যাচ্ছে না। নিকোলাসকে চুপ মেরে যেতে দেখে মাইকেল বললো, 'চলুন, আশপাশটা খুঁজে দেখা যাক। কপাল ভালো হলে ছোটখাটো একটা নৌকো পেয়েও যেতে পারি।'

তিনজন তিনদিকে খুঁজতে বেরুলো। নাদিয়া আর নিকোলাস

www.boiRboi.blogspot.com

হনহন করে অনেকটা এগিয়ে গেলো। কিন্তু মাইকেলের সে-ক্ষমতা নেই। হাত আর পা দিয়ে সবকিছু ছুঁয়ে দেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে সে। বেকায়দায় চলতে গিয়ে কয়েকবার হোঁচট খেয়েছে। তাই খুব সাবধানে পথ চলছে। তীর থেকে বেশ অনেকটা দূরে চলে এলো মাইকেল। হঠাৎ কিসের সাথে যেন পা আটকে গেলো। মাটিতে বসে পড়লো সে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো জিনিসটা—বালির বস্তার মতো কি যেন! একটা নয়, বেশ কয়েকটা। চিৎকার করে নাদিয়া আর নিকোলাসকে ডাক দিলো সে। দৌড়ে এলো ওরা। দেখলো মাইকেলের পায়ের কাছে কৌমিস ভর্তি অনেকগুলো বড় বড় চামড়ার ব্যাগ। এক ধরনের সাইবেরিয়ান পানীয় এই কৌমিস। সাধারণতঃ উটের দুধ থেকে তৈরি হয়। খেতে দারুণ মজা।

'এগুলো কিসের ব্যাগ?' জিজ্ঞেস করলো মাইকেল।

'কৌমিসের,' বললো নিকোলাস, 'চলুন ব্যাগগুলো গাড়িতে নিয়ে তুলি। খাবার ফুরিয়ে গেলে এগুলোই আমাদের জীবন বাঁচিয়ে দেবে।'

'না। এগুলো থেকে কেবল একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে বাকিগুলো জলদি খালি করুন। ওগুলোয় বাতাস ভরে কিবিটকার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে।'

বুদ্ধিটা মনে ধরলো সবার। নদী পেরুতে হলে গাড়িসুদ্ধই পাড়ি দিতে হবে। ব্যাগের বাতাস কিবিটকাকে বয়ার মতো ভাসিয়ে রাখবে। দেরি না করে ব্যাগগুলো চটপট কিবিটকার সঙ্গে জুড়ে দিলো নিকোলাস। তারপর সেটা নামানোর চেষ্টা চললো নদীর পানিতে। ঘোড়াটা প্রথমে নামতে চাচ্ছিলো না ডুবে যাবার ভয়ে। নিকোলাস তাই কিবিটকা থেকে একটা ব্যাগ খুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে

দিলো। ঘোড়াটাকে এবারে গাড়িসুদ্ধ পানিতে নামানো হলো। হাওয়ার টানে ধীরে ধীরে ভেসে চললো গাড়ি। পেছন পেছন সাঁতরে ছুটে আসছে সার্কো।

মাঝনদীতে গিয়ে গাড়িটা ঘূর্ণিপাকে আটকে গেলো। ঘোড়াসুদ্ধ গাড়িটা ঘুরছে তো ঘুরছেই। ঘূর্ণির গতিবেগ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘোড়াসুদ্ধ গাড়িটা হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়লো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সবাই। ঘূর্ণির গতিবেগ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছিলো তাতে গাড়িটা ভেঙেচুরে যাওয়াও বিচিত্র কিছু ছিলো না।

ঘূর্ণির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে হলো আরেক বিপদ। গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে। তাই সোজা ওপারের দিকে আর যাচ্ছে না গাড়ি। কোণাকুণি ভাবে ভেসে চলেছে। খুঁজেপেতে লম্বা একটা লাঠি বের করলো নিকোলাস। ছোট একটা তক্তাও খুঁজে পাওয়া গেলো। আর তাই দিয়ে তৈরি হলো বৈঠা। শক্ত হাতে বৈঠা বাইতে লাগলো নিকোলাস। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরে গেলো গাড়ির। আবার সোজাসুজি ভেসে চললো সেটা। হঠাৎ নাদিয়া লক্ষ্য করলো, দ্বীপের মতো দেখতে একখণ্ড জমি ভেসে আসছে। যদি গাড়িসুদ্ধ সেটার ওপর গিয়ে ওঠা যায় তো মন্দ কি; জমিটাও তো ভাসতে ভাসতে ওপারের দিকেই চলেছে। —ভাবলো সে। নিকোলাস আর মাইকেলকেও বললো কথাটা। ওরা দুজনও কোনো আপত্তি করলো না এতে। কারণ ঘোড়াটার ওপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে আর সার্কোও সাঁতরাতে সাঁতরাতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

দ্বীপটাতে চড়ে বসলো সবাই। ধীরে ধীরে সেটা ভেসে চললো তীরের দিকে। অনেকক্ষণ পর ওদের দ্বীপ-নৌকাটা তীরে এসে ঠেকলো। 'উঃ, কি কষ্টটাই না করতে হয়েছে আজ,' তীরে নামতে

গিয়ে বললো নাদিয়া।

'যাই বলুন, দারুণ জমেছিলো কিন্তু! রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার,' বললো নিকোলাস।

বারো

ইরকুটস্কের রাস্তা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো মাইকেলরা। ২৮ আগস্ট ওরা পৌঁছলো বালাইস্ক শহরে। শহরের লোকজন সব উধাও। যাদুমন্ত্রের মতোই শহরের বাসিন্দারা যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছে। হাট-বাজার কিংবা সরাইখানাগুলো একটাও আস্ত নেই। রাশিয়ান বাহিনী পিছু হটার সময় সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। তাতাররা শহর দখল করলেও যাতে রসদের সরবরাহ না পায় তাই এই ব্যবস্থা। বালাইস্ক ছেড়ে সামনে এগুলো ওরা। রিবিনস্ক আর কামাস্কও পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো ওরা। ৪ সেপ্টেম্বর ওদের কিবিটকা এসে পৌঁছলো বিরিঔবিনস্ক শহরে। এখানেও সেই একই অবস্থা। তাতারদের ফাঁদে ফেলবার জন্যে সরকারি বাহিনী সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হটে গিয়েছে। চিন্তায় পড়ে গেলো ওরা। সঙ্গে যা খাবার রয়েছে তাতে বড়জোর আরো দু'তিনদিন চলতে পারে। এই কয়েকদিনের মধ্যে খাবারের সন্ধান না পেলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। নিজেদেরকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকেই

www.boiRboi.blogspot.com

এগিয়ে চললো ওরা।

পথের যেন আর শেষ নেই। দিন-রাত সমানে চলছে গাড়ি। মাঝেমধ্যে ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে। নিজেরা কম করে খেয়েও ঘোড়াটাকে খাওয়াতে হচ্ছে পেট পুরে। ওদের যাত্রাপথের একমাত্র অবলম্বন এই অবলা পশুটা।

ঘুমে নাদিয়া আর মাইকেলের চোখ ঢুলু ঢুলু করছে। চালকের আসনে নিকোলাস। গাড়ি চালানোর দায়িত্বটা ওরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। মাইকেলও জোর করে এই দায়িত্বে শরিক হয়েছে। অবশ্য রাস্তাঘাট একেবারেই খালি। তাই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো পিগাসফ, 'সর্বনাশ! এবারে আর রক্ষা নেই।'

'কেন? আবার কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো নাদিয়া।

'একটা খরগোস দৌড়ে গিয়ে পাশের ঝোপে ঢুকলো।'

সাইবেরিয়ায় একটা কুসংস্কার চালু আছে। কেউ যদি পথ চলতে গিয়ে কোনো খরগোসকে দৌড়ে যেতে দেখে তাহলে নাকি অমঙ্গল হয়।

'এ যুগের মানুষ আপনি; ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে কি চলে? এসব অলুক্ষণে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন তো!'

নাদিয়ার কথায় তেমন কোনো কাজ হলো না। মুখ ব্যাজার করে ঠায় বসে রইলো নিকোলাস। মাইকেলও অনেক বোঝালো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তার সেই একই কথা, 'পথে খরগোস দেখার অর্থ যমদূতের সঙ্গে দেখা হওয়া। আপনারা হয়তো পার পেয়েও যেতে পারেন; কিন্তু আমার আর রক্ষা নেই।' এরপর নিকোলাসকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা—তাই ওরা দুজনেই চুপ মেরে গেলো।

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়ির চলায় কোনো বিরাম নেই। তবুও পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। এখান থেকে নিজনি ওভিনস্ক এখনো পঁচাত্তর ভার্স্ট দূরে। কে জানে, তাতার বাহিনী এরই মধ্যে সেখানে আক্রমণ চালিয়েছে কিনা!

বিকেলের দিকে মাইকেলরা নিজনি ওভিনস্কের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। দূর থেকেই কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া নজরে পড়লো ওদের। 'এ নিশ্চয়ই তাতারদের কাজ। শহরের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে,' বললো নাদিয়া।

'এরা কিন্তু ফিওফার খানের সেনাবাহিনী নয়; তাতারদেরই অন্য আরেকটা দল,' বললো মাইকেল, 'কারণ আইভানদের বাহিনীকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা।'

'শহরে ঢুকবেন, নাকি এখান থেকেই ফিরে যাবেন?' জিজ্ঞেস করলো নিকোলাস।

'এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না। কপালে যা ই লেখা থাক না কেন, যেতে আমাদের হবেই,' বললো মাইকেল।

গাড়ি এগিয়ে চললো শহরের রাস্তা ধরে। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা। একটা গুলি এসে লাগলো গাড়ির চাকায়। দেরি না করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলো নিকোলাস। কিন্তু ততক্ষণে চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে তাতার বাহিনী। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে বিঁধছে গাড়ির গায়ে। বাধ্য হয়ে গাড়ি থামালো নিকোলাস। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ছুটে এলো তাতাররা। তারপর মেতে উঠলো নিষ্ঠুর এক খেলায়। একজন ধারালো একটা ছুরি দিয়ে মাইকেলদের ঘোড়াটার দুটো চোখই অন্ধ করে দিলো। তারপর মাইকেলকে বসানো হলো সেটার পিঠে। অন্ধ ঘোড়া দিগবিদিক

জ্ঞানশূন্য হয়ে দিলো ছুট। ভাগ্য ভালো মাইকেলের। সুযোগমতো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লো সে। কিন্তু বেকায়দামতো দৌড়াতে গিয়ে ঘোড়াটার পা ছুটো গেলো মচকে; মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বেচারা। এবারে আর একটা ঘোড়ার পেছনে বাঁধা হলো মাইকেলকে। পিঠে চাবুক পড়তেই ছুটে চললো ঘোড়াটা। উঁচুনিচু পথের ঝাঁকুনিতে মাইকেলের রক্ষারক্ষা হবার জোগাড়! এছাড়া ঝোপঝাড় আর কাঁটাগাছের আঁচড় খেয়ে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠলো ওর। মাইকেলের ব্যাপারে তাতাররা আর আগ্রহ দেখালো না—ওর কি পরিণতি হতে পারে তা যেন জানাই আছে সবার। নিকোলাস আর নাদিয়াকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে নিজেদের ডেরার দিকে রওনা দিলো তাতাররা।

ওদিকে মাইকেলকে নিয়ে ঘোড়াটা ছুটেই চলেছে। ঝোপঝাড়ের কাঁটায় শরীরের বিভিন্ন জায়গা ছড়ে গিয়ে রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওর গোটা শরীর। হঠাৎ দড়িটা গেলো ছিঁড়ে। জ্ঞান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে নতুন জীবন ফিরে পেলো মাইকেল। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে নিয়ে হাতের বাঁধনটা দাঁত দিয়ে কাটলো; তারপর তাতারদের ছাউনি খুঁজে বের করতে লেগে গেলো সে।

তাতারদের ডেরায় তখন মদের ফোয়ারা বইছে। নেশার ঘোরে একজন তাতার নাদিয়াকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করে দিলো। তাই দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলো না নিকোলাস। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে তাতারটার ওপর লাফিয়ে পড়লো সে—শয়তানটার পকেট থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে ওর বুক লক্ষ্য করে দিলো ট্রিগার টিপে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাতারটা। বাকিরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর। একজন ছোরা বের করে যেই নিকোলাসের বুকে বসাতে

www.boiRboi.blogspot.com

যাবে অমনি বাধা দিয়ে উঠলো দলের নেতা। বললো, 'ওর বিচার পরে হবে। এখন সবাই সামনের দিকে রওনা হয়ে যাও।'

নিকোলাস লোকটাকে গুলি করতেই সবাই উত্তেজিত হয়ে ওর ওপর চড়াও হয়েছিলো; নাদিয়ার দিকে কারো লক্ষ্য ছিলো না। এই সুযোগে পা টিপে টিপে শিবিরের বাইরে বেরিয়ে এলো সে। নিকোলাসকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলো তাতার সেনারা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবছে নাদিয়া। এখন কোথায় যাবে, কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে। এমন সময় দেখতে পেলো দূরে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে। ওটা কোনো জন্তু নাকি মানুষ অন্ধকারে তা বোঝা যাচ্ছে না। এগিয়ে গেলো সে। কাছে গিয়েই খুশিতে চিৎকার করে উঠলো—এযে মাইকেল!

'এবারে কোন্‌দিকে যাবো, আমরা?'

'যেদিকে গেলে ইরকুটস্ক পৌঁছনো সহজ হয়, আমরা সেদিকেই যাবো,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো মাইকেল।

'কিন্তু তোমার শরীরের যা অবস্থা তাতে এতোটা পথ কি হেঁটে পেরুতে পারবে?'

'পারতেই হবে,' চড়া গলায় বললো মাইকেল, 'যেভাবেই হোক গ্র্যাণ্ড ডিউককে সতর্ক করতে হবে। নইলে গোটা সাইবেরিয়াই দখলে চলে যাবে তাতারদের।'

আবার শুরু হলো পথচলা। চলতে গিয়ে দুজনেই মাঝেমধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ছে। গা-হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে, তবুও পথ চলায় বিরাম নেই।

১৮ সেপ্টেম্বর। ইরকুটস্কের আরো কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওরা। দিন দুয়েক ধরে পেটে তেমন কিছুই পড়েনি। ঝোপঝাড় থেকে

জংলী ফলমূল খেয়ে কোনোরকমে পেটের ক্ষুধা মিটিয়েছে। রাত গভীর হয়েছে ; তবুও দুজন একটানা হেঁটে চলেছে। হঠাৎ রাস্তার ধারের জঙ্গল থেকে কুকুরের করুণ স্বর ভেসে এলো। আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো ওরা। যা দেখলো তাতে গা শিউরে উঠলো নাদিয়ার। নিকোলাস। গোটা শরীরটা ওর মাটিতে পোঁতা। কেবল মুখের অংশটুকুই বাইরে। কাছে গিয়ে নাকের কাছে হাত ধরলো নাদিয়া—না, প্রাণটুকু এখনো বেরিয়ে যায়নি। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুবই ধীর। চোখে দেখতে না পেলেও ঘটনাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না মাইকেলের। পাগলের মতো নিকোলাসের চারপাশের মাটি সরাতে শুরু করলো সে। নাদিয়াও ওর সঙ্গে যোগ দিলো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলো নিকোলাস। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মিছেই চেষ্টা করছো তোমরা। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে…।' দম নেয়ার জন্যে থামলো সে। 'তাতাররা যাবার সময় আমাকে মাটি-চাপা দিয়ে গেছে। নইলে হয়তো মেরেই ফেলতো…।' লম্বা দম নিলো সে, 'আজ তিনদিন ধরে এই অবস্থায় আছি। অনেক আগেই মারা যেতাম…সার্কোই শিয়াল, কুকুর আর শকুনের হাত থেকে… বাঁচিয়ে…রেখেছে আমাকে।'

নিকোলাসের কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না মাইকেলের। দুহাত দিয়ে মাটি সরিয়েই চলেছে সে। আর একটুখানি মাটি তুলতে পারলেই ওকে টেনে বের করা যাবে। এমন সময় আবার কথা বলে উঠলো নিকোলাস, 'নাদিয়া, মাইকেল, আ…আমি চললাম। তোমরা ভা…লো…থেকো,' বলেই একটা খিঁচুনি তুলে স্থির হয়ে গেলো দেহটা। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলো মাইকেল—সত্যি সত্যিই ওদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে নিকোলাস। এগিয়ে এলো সার্কো। প্রভুর

www.boiRboi.blogspot.com

শরীরের কাছে এসে গন্ধ শুঁকলো। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলো। কান্না আর কিছুতেই থামতে চায় না। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো সে। একটা শক্ত মাটির ঢিবিতে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করলো কুকুরটা। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে তবুও থামার কোনো লক্ষণ নেই। নাদিয়া একবার বাধা দিতে গিয়ে কামড় খাওয়া থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে। হঠাৎ কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেই ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়লো কুকুরটা। তারপর একটা খিঁচুনি তুলে স্থির হয়ে গেলো। প্রভুর পথ ধরে সে-ও চলে গেলো অন্য জগতে।

তাতাররা যে গর্তটায় নিকোলাসকে পুঁতে রেখে গিয়েছিলো সেখানেই কবর দেয়া হলো তাকে। পাশেই ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে ওরা সার্কোকে শুইয়ে দিলো। তারপর নিকোলাসের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করে আবার যাত্রা শুরু করলো ওরা।

আরো দুশো ভার্স্ট পেরুতে পারলে ইরকুটস্কে পৌঁছবে ওরা। কিন্তু কিভাবে! শরীরে নেই একবিন্দু শক্তি ; সঙ্গে নেই এতটুকু খাবার। এতক্ষণ সমতল রাস্তা ধরে ধরে হাঁটছিলো ওরা। এবারে সামনে পড়লো ডিয়ানস্ক পাহাড়। অসাধারণ মনের জোরে বিরাট পাহাড়টাও পেরুলো ওরা।

একটানা বারো দিন পথ চলার পর ২ অক্টোবর মাইকেলরা পৌঁছে গেলো বৈকাল হ্রদের তীরে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭০০ ফুট উঁচু এই বৈকাল হ্রদ। লম্বায় নয়শো ভার্স্ট আর চওড়ায় একশো ভার্স্টের কাছাকাছি। হ্রদের চারপাশটা জুড়ে আগ্নেয়গিরির প্রাচীর। অনেকগুলো ছোট বড় নদী এসে মিশেছে

এই হ্রদে। এখান থেকে একটা শাখা নদী এঁকেবেঁকে জেনিসী নদীর সঙ্গে মিশেছে। নদীটার নাম আঙারা—আর এর তীর ঘেঁষে উঁকি দিচ্ছে সাইবেরিয়ার রাজধানী ইরকুটস্ক।

হ্রদ এলাকার আবহাওয়া বড় অদ্ভুত রকমের। ঋতুর কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। শীতের সময় কখনো কখনো কাঠফাটা রোদে টেকা দায় হয়ে ওঠে; আবার গরমকালে হীমেল হাওয়া বয়। এখন অক্টোবর; অন্যান্য জায়গায় শীত নামতে এখনো ঢের দেরি। কিন্তু হ্রদ-এলাকার চারপাশে এখনই বরফ জমতে শুরু করেছে।

হ্রদের তীরে একদল মেয়ে আর পুরুষ। চেহারায় চেনা যায়—সবাই সাইবেরিয়ান। এদের কয়েকজন দেবদারু গাছ কেটে ভেলা বানাচ্ছে। ভেলায় চেপে ওরা ইরকুটস্ক যাবে। নাদিয়া আর মাইকেলও ভিড়ে গেলো ওদের দলে। একটু পরে পানিতে নামানো হলো ভেলা। সবাইকে নিয়ে সেটা ভেসে চললো ইরকুটস্কের দিকে।

আঙারা নদীতে ঢুকে ভেলার গতি গেলো বেড়ে। খরস্রোতা নদী হিসেবে আঙারার নাম আগেই শুনেছিলো নাদিয়া। এবারে নিজের চোখে দেখলো, আঙারার স্রোত কি জিনিস। তরতর করে ভেলাটা ছুটছে তো ছুটছেই। দেখতে দেখতে সেটা লিভেনিচিয়া বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। বন্দরে পৌঁছে বেশ অবাক হলো সবাই। কোনো জাহাজ কিংবা নৌকোর চিহ্নমাত্রও নেই। তাতারদের ভয়ে লোকজনেরা আগেই এখান থেকে সরে পড়েছে। খানিকক্ষণের জন্যে ভেলাটাকে ভিড়ানো হলো বন্দরে। লোকজন যে যার মতো ভেলা থেকে নেমে হাত-পা খেলাতে লেগে গেলো। এর কিছুক্ষণ পর আবার ভেলা ছাড়ার আয়োজন চলতে লাগলো। এমন সময় দুজন লোক কোত্থেকে যেন ছুটে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওদের ভেলার

www.boiRboi.blogspot.com

ওপর। লোক দুজন আর কেউ নয়—অ্যালসাইড জুলিভেট আর হ্যারি ব্লাউন্ট। নাদিয়া আর মাইকেলকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো ওরা। নাদিয়ার কাছে মাইকেলের অন্ধ হবার কথা শুনে দুজনের চোখে অশ্রু টলমল করে উঠলো।

ফিওফার খানের বাহিনী ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো জুলিভেটরা। কিন্তু অন্যান্য তাতাররা বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। তাই পায়ে হাঁটা পথ ছেড়ে নৌকোর খোঁজে এসেছিলো ওরা। ভেলাটা দেখতে পেয়ে হুড়মুড় করে উঠে পড়েছে তাতে। লোকজনেরা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলো ওদের কাণ্ড দেখে। কিন্তু যখন জানলো, মাইকেলদের পরিচিত ওরা; তখন ওদেরকে সঙ্গে নিতে কোনো আপত্তি করলো না তারা।

মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলো জুলিভেট, 'ফ্রেণ্ড, এ অবস্থায় ইরকুটস্ক যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে আপনার?'

'ঠিক বেঠিক জানি না, কিন্তু যেতে আমাকে হবেই,' বললো মাইকেল। 'আর একটা কথা। আমার আসল পরিচয় আর কেউ যাতে জানতে না পারে এ ব্যাপারে আপনাদের দুজনকে কথা দিতে হবে,' জুলিভেট আর ব্লাউন্টের হাত চেপে ধরলো মাইকেল।

'কথা দিলাম,' দুজনের হয়ে বললো জুলিভেট। 'আর হ্যাঁ। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলতে কিন্তু দ্বিধা করবেন না।'

আঙারার স্রোতের টানে ছুটে চলেছে ভেলাটা। রাত গভীর হয়েছে। যাত্রীদের বেশিরভাগই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু নাদিয়ার চোখে ঘুম নেই—মাইকেলকে সারাক্ষণ আগলে রাখছে সে। ঘুম নেই দুই সাংবাদিকের চোখেও। বহুদূরের কোনো কোনো গ্রামে লকলকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—

কাজটা তাতার গুপ্তাদের। জুলিভেটরা তাকিয়ে রয়েছে সেদিকেই। মাঝেমধ্যে নোট বই বের করে অন্ধকারেও কিসব যেন লিখে নিচ্ছে ওরা।

তেরো

ভেলাটা আগের মতো আর তরতরিয়ে এগুচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় বরফের চাঁই পথ আটকে দিচ্ছে ওদের। বুড়ো মাঝিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে জুলিভেট। একটা লগি দিয়ে বরফের চাঁইগুলো সরিয়ে দিচ্ছে সে। বরফের চাকগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ভেলাটাকে। এগুতে গিয়ে বারে বারে বাধা পাচ্ছে ওরা। বুড়ো মাঝি সাধ্যমতো চেষ্টা করছে; কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। দূরে বড় একটা বরফের চাঁই দেখা গেলো। দেখতে বিরাট একটা দ্বীপের মতো। ভেলার দিকেই ভেসে আসছে সেটা। চাকটা কাছাকাছি আসতেই কে যেন চিৎকার করে উঠলো—তাতার! কিছু কালো মাথা দেখা যাচ্ছে; খুব সম্ভবতঃ মানুষের মাথা ওগুলো—অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লোকগুলো নিশ্চয়ই তাতার নয়; এতক্ষণে তাহলে গুলিগোলা শুরু হয়ে যেতো। আশপাশের গ্রামের লোক হবে হয়তো; তাতারদের অত্যাচারেই হয়তোবা এই বরফ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। —মনে মনে ভাবলো জুলিভেট।

www.boiRboi.blogspot.com

ভেলাটা দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেলো সবার। বিরাট চাঁইটার ওপর যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা তাতার কিংবা গাঁয়ের লোক নয়—একদল নেকড়ে। বুড়ো মাঝি ভেলার মুখ ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো; কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

ভেলাটা দ্বীপের হাত চারেকের মধ্যে পৌঁছতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো নেকড়ের পাল। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, দ্বীপটার কাছাকাছি পৌঁছেই অন্য একটা বরফের চাকে আটকে গিয়ে আর এগুলো না ভেলা। নেকড়েগুলোকে তখন শিকার ধরার নেশায় পেয়ে বসেছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে ওগুলো। কিন্তু ভেলাটা একটু দূরে থাকায় বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না।

শুরু হলো যুদ্ধ। নেকড়ের পাল এগিয়ে এলেই লগি নিয়ে তেড়ে আসে ভেলার লোকজন। ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে যায় নেকড়েরা—কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যে। সামান্য পিছু হটে আবার হুংকার ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসে। মাঝেমধ্যে লাফ দিয়ে ভেলায় উঠতে চায়। কিন্তু দূরত্বের কথা ভেবেই হয়তো সামলে নেয় নিজেদের। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ কি দেখে যেন ভয় পেয়ে গেলো নেকড়েরা। গুড়গুড় করে পিছু হটতে আরম্ভ করলো ওরা। আগুন! —ফিসফিসিয়ে বললো জুলিভেট। তাতাররা কাছেই কোনো গ্রামে আগুন দিচ্ছে। আগুনের লকলকে শিখা যেন আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। নেকড়েরা আলো সইতে পারে না। তাই ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ওগুলো।

বেশ দূরে সরে গেলো নেকড়ের দল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো মাঝি অন্য বরফের চাঁইটাকে লগি দিয়ে সরিয়ে ভেলার মুখ দিলো

ঘুরিয়ে।

ভেলা আবার চলতে শুরু করলো। বেখেয়ালে পা'টা ঝুলিয়ে বসতে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো জুলিভেট—বরফগলা পানিতে পা খেলানোর মজা হাড়ে হাড়ে টের পেলো। তাড়াতাড়ি পা'টা তুলে নিয়ে মালিশ করতে লেগে গেলো। আর তা করতে গিয়ে নতুন একটা জিনিস আবিষ্কার করলো সে। নদীর পানিতে তেলতেলে কিছু একটা মিশে রয়েছে। পা'টা ডলতে গিয়ে বুঝতে পারলো জুলিভেট। নাকের কাছে হাত নিয়ে টের পেলো—জিনিসটা ন্যাপথা, এক ধরনের খনিজ তেল। আগুন পেলে পেট্রোলের মতোই দপ করে জ্বলে ওঠে। জুলিভেট কিছুতেই ভেবে পেলো না, নদীর পানিতে ন্যাপথা এলো কি করে! তাতারদের কারসাজি নয় তো? —ভেলার সবাইকে কথাটা বললে মিছেই একটা হৈ হট্টগোলের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ওদেরকে আগুন জ্বালানো থেকে বিরত রাখার জন্যে বললো, 'খবরদার! তাতার সৈন্যরা কিন্তু আমাদের কাছাকাছিই রয়েছে। ভেলায় আগুন দেখলে টের পেয়ে যাবে ওরা। মহা বিপদে পড়তে হবে তখন সবাইকে।' জুলিভেটের কথায় কাজ হলো। যে দু'চারটে লণ্ঠন জ্বেলে রাখা হয়েছিলো সেগুলোও নিভিয়ে ফেললো ভেলার লোকজন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জুলিভেট। আগুন জ্বালানো থেকে সবাইকে বিরত রাখা গিয়েছে। নইলে যে কোনো মুহূর্তে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারতো। আগুনের একটা স্ফুলিংগেই যথেষ্ট—গোটা নদী জুড়ে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে।

গ্রামগুলোতে আগুন দিয়েই চলেছে তাতাররা। নদীর খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে ওরা। মনে মনে প্রমাদ গুণলো জুলিভেট। আগুনের শিখা রাতকে দিন বানিয়ে ছেড়েছে। ওদের ভেলাটাকে

www.boiRboi.blogspot.com

তাতাররা না জানি আবার দেখে ফেলে। আর আগুন যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে এক-আধটা ফুলকি নদীতে এসে পড়াও অসম্ভব নয়।

হঠাৎ কি করে যেন ভেলাটা নজরে পড়ে গেলো তাতারদের। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। কয়েকজন দারুণভাবে জখম হলো এতে। মাইকেলের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো নাদিয়া। তারপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। ওদের দেখাদেখি জুলিভেট, ব্লাউন্ট আর ভেলার অনেকেই নদীতে ঝাঁপিয়ে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু এতে যারা ইতস্ততঃ করছিলো, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকেই তাতারদের গুলিতে মারা পড়লো।

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেই ছোট একটা বরফের চাঁইয়ে ধাক্কা খেলো নাদিয়া। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো সে। চাঁইটা ছোট হলেও দুজন বসার জন্যে যথেষ্ট। মাইকেলকে নিয়ে তাতেই উঠে বসলো সে। বরফের ভেলাটা ধীরে ধীরে ভেসে চললো উত্তরের দিকে।

চোদ্দ

ইরকুটস্ক। আঙারা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই শহর। ছবির মতো সুন্দর এ শহরের লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। কিন্তু তাতারদের ভয়ে বিভিন্ন শহর থেকে লোকজন এসে জড়ো হওয়ায়

এখন এর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লক্ষে। শুধু সাইবেরিয়ার রাজধানী বলেই নয়; শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়েও ইরকুটস্কের গুরুত্ব কম নয়। এখান থেকে গোটা সাইবেরিয়া শাসন করেন জারের ভাই, মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউক।

একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্যে সেন্ট্রাল এশিয়ায় গিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। ভেবেছিলেন ইরকুটস্কে ফিরে এসে মস্কোর দিকে রওনা দেবেন। কিন্তু তা আর হলো না। রাজধানীতে ফিরে শুনতে পেলেন, দেশের নানান জায়গায় তাতার বিদ্রোহীরা অভিযান চালিয়েছে। টমস্ক, ওমস্ক আর অন্যান্য বড় বড় শহরগুলো এখন বিদ্রোহীদের কব্জায়। আরো শুনলেন, বিরাট এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ইরকুটস্কের দিকে ধেয়ে আসছে বোখারার আমীর ফিওফার খান। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মস্কোতে টেলিগ্রাম করার চেষ্টা করলেন ডিউক; কিন্তু এর আগেই টেলিগ্রাফের তারগুলো কেটে দিয়েছে তাতাররা। গ্র্যাণ্ড ডিউক বুঝতে পারলেন, পরিস্থিতি যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে মস্কো থেকে সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এতে মোটেই দমলেন না তিনি। ইরকুটস্ক আর আশেপাশে যে সমস্ত সেনাদল ছিলো তাদের সবাইকে একসঙ্গে জড়ো করলেন ডিউক। রাজধানীর চারপাশের শহর আর গ্রামের লোকজনকে তাড়াতাড়ি রাজধানীতে চলে আসতে হুকুম করলেন। দলে দলে লোকজন এসে জড়ো হলো ইরকুটস্কে। সঙ্গে নিয়ে এলো সমস্ত খাবার দাবার। এতে একদিকে যেমন নিজেদের খোরাকের কোনো সমস্যা হবে না অন্যদিকে তেমনি তাতার বাহিনীকেও কিছুটা বেকায়দায় ফেলা যাবে। কারণ দখল করা এলাকা থেকে রসদ জোগাড় করতে না পারলে আপনিই কমজোর হয়ে পড়বে তাতার

www.boiRboi.blogspot.com

গুণ্ডারা।

শহরের মেয়র ইরকুটস্কের চারদিক ঘিরে পাঁচিল তুলতে আদেশ দিলেন। এ কাজে হাজার হাজার লোক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো। দিনরাত একটানা পরিশ্রম করলো ওরা। মাত্র তিনদিনেই ইরকুটস্কের চারদিক ঘিরে গজিয়ে উঠলো বড় একটা প্রাচীর।

তাতারদের যে দলটা আঙারা নদী বরাবর এগুচ্ছিলো, এবারে তারা ইরকুটস্কের কাছাকাছি এসে ছাউনি ফেললো। আইভান আর ফিওফার খানের সেনাবাহিনী এসে পৌঁছলে তখন একসঙ্গে ইরকুটস্ক আক্রমণ করবে সবাই।

২৫ সেপ্টেম্বর ফিওফার খান আর আইভান তাদের দলবল নিয়ে আঙারা নদীর তীরে এসে পৌঁছলো। আগের দলটাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে আরো কয়েক ভার্স্ট সামনের দিকে এগুলো ওরা। ইরকুটস্কের একেবারে কাছে এসে ছাউনি ফেললো এবার। আইভান কিছুটা অবাক হলো, যখন দেখলো শহরের চারদিক ঘিরে পাঁচিল তোলা হয়েছে। এতে কিন্তু মোটেই দমলো না সে। তাড়াতাড়ি আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। সে ভালো করেই জানে, আক্রমণে দেরি হলে সরকারি বাহিনীর শক্তি বেড়ে যাবে। গুপ্তচরের কাছ থেকে সে খবর পেয়েছে, ইরকুটস্ক রক্ষা করার জন্যে ইয়াকুটস্ক থেকে বিরাট এক সেনাবাহিনী রওনা দিয়েছে। তাই ঝটপট আক্রমণের জন্যে তৈরি হলো আইভান।

কয়েকদিন পরে পরপর দুবার আক্রমণ চালালো আইভান। কিন্তু কশাক বাহিনী আর সাধারণ লোকজনেরা দু'দুটো আক্রমণেরই দাঁতভাঙা জবাব দিলো। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হলো তাতার ফৌজ। সরকারি বাহিনীকে অবজ্ঞা করার মজাটা

হাড়ে হাড়ে টের পেলো সে। শুধু সেনাবাহিনীই নয়, শহরের লোকজনও বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ালো তাতারদের বিরুদ্ধে।

বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো আইভান। ঝটপট ইরকুটস্কের পতন ঘটাতে না পারলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। কারণ ইয়াকুটস্ক থেকে সেনাবাহিনী এসে পড়লে কিছুতেই আর ইরকুটস্ক দখল করা যাবে না। আইভান বেশ বুঝতে পারলো ; সোজাসাপ্টা যুদ্ধে কাজ হবে না—কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কি কৌশলের আশ্রয় নেবে সে এখন ? ইরকুটস্কের চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ; চর পাঠিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, এমন সুযোগও নেই। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লেগে গেলো সে। চোখমুখ গম্ভীর। হঠাৎ গম্ভীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দৌড়ে চললো সে ফিওফার খানের ডেরার দিকে। মাথায় নতুন কোন্ শয়তানি বুদ্ধি খেলে গেলো কে জানে!

২ অক্টোবর সন্ধ্যায় গ্র্যাণ্ড ডিউকের প্রাসাদে এক জরুরী মিটিং বসেছে। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়, সে ব্যাপারে শহরের গণ্যমান্য লোকজনের সাথে খোলাখুলি আলাপ করছিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। গলাটা একটু কেশে নিয়ে বলতে শুরু করলেন তিনি, 'আমরা আজ দারুণ এক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। তাতার গুণ্ডারা দেশের অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছে। এখন তারা খোদ রাজধানীর দোরগোড়ায় এসে আস্তানা গেড়েছে। যদি রাজধানীতে ওরা একবার ঢুকতে পারে, তবে গোটা রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

'আমাদের এক বিরাট বাহিনী ইয়াকুটস্ক থেকে রওনা দিয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। কাজেই শহরকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সবাইকে অস্ত্র ধরতে হবে। শত্রুরা দু'বার আমাদের হাতে নাজেহাল হয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বার তারা মরণ কামড় দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান তাহলে আসুন, সবাই মিলে তাতারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরি।'

দম নেয়ার জন্যে থামলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। এই ফাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'হাইনেস, ইয়াকুটস্ক থেকে কবে নাগাদ সেনাবাহিনী এসে পৌঁছবে ?'

'দিন সাতেকের আগে নয় ; কিন্তু এর আগেই তাতাররা হামলা চালাবে।'

'হামলার উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্যে শহরবাসীরা সবাই প্রস্তুত, হাইনেস,' বললো শহরের মেয়র।

'কিন্তু এবারের হামলা অনেক বেশি জোরদার হবে। দু' দুবার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে তাতাররা। কাজেই এবারে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ চালাবে। সুতরাং শত্রুর মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরও লোকজন বাড়াতে হবে।'

কিন্তু কিভাবে ? গ্র্যাণ্ড ডিউকের কথায় সবার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। এমন সময় শহরের পুলিশ প্রধান বললো, 'হাইনেস, দেশ আজ এমন এক সংকটের মুখোমুখি, যা থেকে উদ্ধার পেতে চাইতে নিজেদের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ বিরোধ ভুলে গিয়ে সবাইকে একজোট হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে,' পুলিশ প্রধানের কণ্ঠে ইতস্ততঃ ভাব। 'আপনি অভয় দিলে একটা প্রস্তাব পেশ করতে চাই।'

''বেশ ; বলুন, কি প্রস্তাব আপনার ?'

'আমি সাইবেরিয়ার নির্বাসিতদের কথা বলতে চাচ্ছিলাম, হাইনেস। বিভিন্ন কারণে তাদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। তবে এর মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যই প্রধান কারণ। এছাড়া চরিত্র সংশোধনের জন্যেও কাউকে কাউকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। অপরাধ এদের যা'ই হোক না কেন, এরা কিন্তু কেউই দেশদ্রোহী নয়। সুযোগ পেলে দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও এরা প্রস্তুত।'

পুলিশ প্রধানের কথা শুনে কিছুটা অবাক হলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। নির্বাসিতরাও যে দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, কথাটা এর আগে মাথায় আসেনি তার। বললেন, 'নির্বাসিতদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে সবার হয়ে দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিতে পারবে?'

'এমন একজন লোককেই সাথে করে নিয়ে এসেছি, হাইনেস। অনুমতি পেলে তাকে ভেতরে আনতে পারি।'

'বেশ। তাকে ভেতরে আসতে বলুন।'

মাঝবয়েসী একটা লোককে দোরগোড়ায় দেখা গেলো। পুলিশ প্রধান ইশারা করতেই ভেতরে ঢুকলো লোকটা। শক্তসমর্থ শরীর, চেহারায় একটা দৃঢ়চেতা ভাব। লোকটাকে একনজর দেখেই পছন্দ হয়ে গেলো গ্র্যাণ্ড ডিউকের। 'কি নাম, তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওয়াসিলি ফেডর, হাইনেস।'

এই সেই ওয়াসিলি ফেডর—নাদিয়ার বাবা। নির্বাসিত জীবনের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা সে একদিনের জন্যেও ভঙ্গ করেনি। তার স্বভাব চরিত্রের জন্যে নির্বাসিতরা তো বটেই, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার লোকজনেরাও বেজায় সন্তুষ্ট। ডাক্তারি বিদ্যেটা জানা ছিলো বলে সব জায়গা থেকেই ডাক পড়তো তার। এমন লোক ইরকুটস্কে খুঁজে

www.boiRboi.blogspot.com

পাওয়া মুশকিল যে নাকি ওয়াসিলি ফেডরকে চেনে না।

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন ডিউক। তারপর বললেন, 'শুনলাম, নির্বাসিতরা নাকি দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে চায়?'

'জ্বি, হাইনেস। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে নির্বাসিতরা সবাই প্রস্তুত।'

'যুদ্ধ মানে কিন্তু ছেলেখেলা নয়। কোনো অবস্থাতেই রণে ভঙ্গ দেয়া চলবে না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। পারবে?'

'পারবো, হাইনেস। শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যাবো আমরা।'

'নির্বাসিতদের সবাই কিন্তু তোমাকেই ওদের সেনাপতি হিসেবে পেতে চায়; তুমি রাজি?'

'আ-আমি! আমি কি এতবড় দায়িত্ব নেয়ার উপযুক্ত, হাইনেস?'

'হ্যাঁ, তুমি। তুমিই এই কাজের জন্যে সবচাইতে যোগ্য লোক। আজ থেকে তুমি আর নির্বাসিত নও—মুক্ত।'

'কিন্তু আমার অন্যান্য বন্ধুদের কি হবে, হাইনেস? ওদেরকে নির্বাসিত জীবনে রেখে আমি নিজের মুক্তি চাই না।'

লোকটা আসলেই খাঁটি সোনা। —মনে মনে বললেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। কিন্তু মুখে বললেন, 'আজ থেকে ওরাও মুক্ত। যাও দেরি করো না। ওদের সবাইকে নিয়ে সেনাদল গড়ে তোলো।'

অশ্রু চিক্‌চিক্ করে উঠলো ওয়াসিলি ফেডরের দু'চোখে। তাই দেখে গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন, 'মানুষ চিনতে আমি ভুল করিনি, ফেডর। জানি, যে কাজের দায়িত্ব তোমার ওপর দেয়া হলো তাতে কোনোরকম গাফিলতি হবে না।'

মিটিং শেষ হলো। বাইরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। এমন সময় একজন প্রহরী এসে বললো, 'মস্কো থেকে একজন রাজদূত এসেছে, হাইনেস। আপনার সংগে দেখা করতে চায়।'

পনেরো

গ্র্যাণ্ড ডিউকের মিটিং রুমে ঢুকলো লোকটা। মাথা নুইয়ে ডিউককে অভিবাদন জানালো। দেখেই বোঝা যায়, পথ চলায় ভীষণ ক্লান্ত সে। পরনে ময়লা পোশাক, মাথায় মস্কো টুপি। পায়ে জুতো নেই। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। গালের একদিকটায় বড় রকমের আঘাত লেগেছিলো বলে মনে হচ্ছে। ঘা শুকিয়ে গিয়ে বিশ্রী একটা দাগ জন্মেছে সেখানে। আপাদমস্তক লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ডিউক। চোখমুখের ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেলো সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'মহামান্য জার পাঠিয়েছেন, তোমাকে?'

'জ্বি, হাইনেস। আমার নাম মাইকেল স্ট্রগফ। মহামান্য জারের পত্রবাহক আমি। আপনার কাছে একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্যে এখানে পাঠিয়েছেন তিনি।'

'কই, দেখি সেই চিঠি?'

পকেট থেকে একটা খোলা চিঠি বের করে ডিউকের দিকে বাড়িয়ে দিলো লোকটা। দুমড়ানো মুচড়ানো চিঠিটা হাতে পেয়ে মেজাজ

www.boiRboi.blogspot.com

চড়ে গেলো ডিউকের। বললেন, 'মহামান্য জার চিঠিটা কি এভাবে দুমড়ে মুচড়ে তোমার হাতে দিয়েছিলেন? আর খামটাই বা গেলো কোথায়?'

'জ্বি না, হাইনেস। উনি খামের ভেতরেই পুরে দিয়েছিলেন চিঠিটা। কিন্তু এ চিঠি তাতারদের হাতে পড়লে বিপদ হতে পারে ভেবে আমিই খামটা ছিঁড়ে ফেলে দিই।'

'তুমি কি তাতারদের হাতে ধরা পড়েছিলে?'

'জ্বি। আর সেজন্যেই এখানে পৌঁছতে এতো দেরি হয়ে গেলো। মস্কো থেকে রওনা দিয়েছিলাম ১৬ জুলাই, আর আজ অক্টোবরের দু'তারিখ।'

চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখলেন ডিউক। নির্ভেজাল। চিঠির নিচে মহামান্য জারের সইটাও তাঁর বহুদিনের চেনা। 'চিঠিতে কি লেখা আছে, তুমি জানো?' জিজ্ঞেস করলেন ডিউক।

'জানি, হাইনেস। চিঠিটা তাতারদের হাতে পড়তে পারে ভেবে আগেই মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তাতারদের হাতে ধরা পড়লাম ঠিকই কিন্তু চিঠির সন্ধান ওরা পেলো না।'

'যাক। এবারে যুদ্ধের খবর বলো। তাতাররা কি সত্যিই আমাদের সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছে?'

'জ্বি। কলিভান, টমস্ক আর ওমস্কে তাতারদের হাতে আমাদের বাহিনী দারুণভাবে মার খেয়েছে।'

'কিন্তু সেসব শহরগুলো রক্ষার জন্যে অন্যান্য এলাকার সেনাবাহিনীরা কি এগিয়ে আসেনি?'

'তারা সময়মতো পৌঁছতে পারেনি। এর আগেই শহরগুলো তাতারদের দখলে চলে যায়।'

'শেষ লড়াইটা কি টমস্কে হয়েছিলো নাকি···।'

'জ্বি না, হাইনেস,' কথার মাঝখানে একরকম বাধা দিয়ে বলে উঠলো লোকটা। 'ক্রেসনয়েয়ার্স্কে শেষ যুদ্ধ হয়েছে। দেড় লক্ষ তাতার সেনার বিরুদ্ধে মাত্র কুড়ি হাজার সরকারি ফৌজ। কাজেই যা হবার তা'ই হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলেন ডিউক, 'ক্রেসনয়েয়ার্স্কের সেনা-ছাউনিতে সবসময়েই অন্তত লাখখানেক সৈন্য থাকে।'

'তা ঠিক। কিন্তু ঐ সময় বেশিরভাগ সৈন্যকে অন্যান্য শহর রক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছিলো। আর সে-সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে তাতার বাহিনী।' —দেদার মিথ্যে বলতে আরম্ভ করলো লোকটা।

লোকটার কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন ডিউক। তাঁর জানামতে ক্রেসনয়েয়ার্স্ক তাতারদের দখলে নয়। অথচ রাজদূত বলছে উল্টো কথা। কি জানি, হয়তো রাজদূতের কথাই ঠিক! লোকটাকে অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই। কারণ চিঠির সইটা যে মহামান্য জারের, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 'আচ্ছা, ইরকুটস্কের চারপাশে কতো হাজার তাতার সৈন্য এসে জড়ো হয়েছে বলে মনে হয়?'

'হাজার কি বলছেন, হাইনেস! ওরা সংখ্যায় চার লাখের কম হবে না,' আবার মিথ্যে বললো লোকটা।

'চার লাখ সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ চালালেও ইরকুটস্ক দখল করতে পারবে না। খুব শিগগির ইয়াকুটস্ক থেকে বিরাট এক সেনাদল এসে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে।'

'কিন্তু তারা শীতের আগে পৌঁছতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ইরকুটস্কের চারদিককার সমস্ত যোগাযোগই তাতাররা নষ্ট করে

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছে।'

দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো গ্র্যাণ্ড ডিউকের চেহারায়। এবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন তিনি। 'চিঠিতে একজন বিশ্বাসঘাতকের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে; তার সম্বন্ধে কিছু জানো?'

'জ্বি, হাইনেস। লোকটার নাম আইভান ওগারেফ। ক্রেসনয়েয়ার্স্কের যুদ্ধে তাতারদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম আমি। ঐ সময় সামনাসামনি তাকে দেখার সুযোগ হয়েছিলো। লোকটা নাকি ছদ্মবেশে এ শহরে ঢোকার চেষ্টা করবে। তারপর কৌশলে শহরের পতন ঘটিয়ে আপনাকে খুন করবে সে।'

'কিন্তু ওদের হাত থেকে তুমি পালালে কিভাবে?'

'ইরতিশ নদী ধরে এগুচ্ছিলো ওরা। সুযোগ বুঝে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। তাতাররা প্রথমে টের পায়নি। পরে টের পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো ওরা। কিন্তু ততক্ষণে আমি ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'সাবাস্! মাইকেল,' লোকটার পিঠ চাপড়ে দিলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক। 'বিপদকে তুচ্ছ করে যেভাবে তুমি দায়িত্ব পালন করেছো, সেজন্যে মহামান্য জারের কাছ থেকে পুরস্কার পাবে তুমি। এখন বলো, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

'আমি কোনো পুরস্কার চাই না, হাইনেস,' বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠলো লোকটা, 'দেশের এই বিপদের সময় যদি আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি তবে তাই হবে আমার জন্যে সবচাইতে বড় পুরস্কার।'

লোকটা একেবারে খাঁটি দেশপ্রেমিক। কেমন নির্লোভ আর নিঃস্বার্থ! —মনে মনে ভাবলেন ডিউক। তারপর বললেন, 'বেশ;

তাই হবে, মাইকেল। তুমি প্রাসাদেই থাকবে। সময়মতো বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে আমাকে। আর একটা কথা, আইভানকে তুমিই একমাত্র চেনো। শয়তানটা নগররক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে যাতে শহরে ঢুকতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখবে তুমি।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যতো ধড়িবাজ লোকই সে হোক না কেন আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছুতেই সে এই শহরে ঢুকতে পারবে না।'

'তোমার কথা শুনে মনটা অনেক হালকা হলো, মাইকেল। কিন্তু এখন আর কোনো কথা নয়; রাত অনেক হলো। এবারে গেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ো,' বলে একজন প্রহরীকে ইশারা করলেন ডিউক। প্রহরীর পেছন পেছন বেরিয়ে গেলো লোকটা। রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় এক ধরনের শয়তানি ফুটে উঠলো লোকটার চেহারায়। পেছন থেকে গ্র্যাণ্ড ডিউক তা দেখতে পেলেন না। নইলে তিনিও হয়তো ভড়কে যেতেন। মাইকেলের পরিচয়ে এই লোকটা আর কেউ নয়—স্বয়ং আইভান ওগারেফ।

ইরকুটস্কের সব জায়গায় অবাধে ঘুরে বেড়াবার অধিকার পেয়েছে আইভান। সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে সে—শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর অবস্থান মনের পর্দায় গেঁথে নিচ্ছে। সুযোগ বুঝে শহরে ঢোকাতে হবে তাতারদের। এ ব্যাপারে বলসিয়া গেটই হবে উপযুক্ত জায়গা। শহরের প্রধান ফটকগুলোর একটা এই বলসিয়া গেট। পাহারা এখানে বেশি জোরদার নয়। কোনোমতে প্রহরীদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই ব্যস, কেল্লাফতে। পিলপিল করে ঢুকে পড়বে তাতার বাহিনী। গোটা শহরটা একরকম বিনা

www.boiRboi.blogspot.com

যুদ্ধেই কব্জা হবে ওদের। কাজটা জলদি সারতে হবে কারণ ইয়াকুটস্ক থেকে সরকারি বাহিনী রওনা দিয়েছে। —মনে মনে ভাবলো আইভান।

ওয়াসিলি ফেডরের তৎপরতা দেখে চিন্তায় পড়ে গেলো আইভান। লোকটা যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমান। শহরের সবাই তার কথায় ওঠা বসা করে। এক চাল খেললো সে। লোকজনের মুখে শুনলো, ওর মেয়ে নাদিয়া রিগা থেকে ইরকুটস্ক আসছে। কথাটা শুনেই শয়তানি বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ওর। ফেডরের কাছে গিয়ে ডাহা মিথ্যে বললো—ক্রেসনয়েয়ার্স্কে তাতারদের হাতে ধরা পড়েছিলো নাদিয়া। বন্দী শিবিরেই পরিচয়। একদিন রাতের বেলায় পালাতে চেষ্টা করেছিলো সে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তাতার প্রহরীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেশিদূর এগুতে পারেনি। ধরা পড়ার পর নাউটের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাকে।

শয়তানিতে কাজ হলো। এ কথা শোনার পর মনের দিক দিয়ে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লো ফেডর। কাজে কর্মে যদিও তৎপরতা কিছুমাত্র কমলো না, তবুও মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনে সবকিছু থেকে কেমন যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেললো সে।

২ থেকে ৪ অক্টোবর। এই তিনদিন তাতাররা একটা গুলিও ছুঁড়লো না। গ্র্যাণ্ড ডিউককে ভুল পথে চালানোর এটা আর একটা কৌশল আইভানের। গুলিগোলা না ছোঁড়া হলে ডিউক হয়তো ভাববেন রণেভঙ্গ দেয়ার পরিকল্পনা করছে তাতাররা। আর আইভানও তাই চায়। সরকারি বাহিনী যেইমাত্র একটু অসতর্ক হয়ে পড়বে অমনি বলসিয়া ফটক দিয়ে ঢুকে পড়বে তাতার বাহিনী।

৪ অক্টোবরের রাত। বলসিয়া ফটকের সামান্য দূরে একটা আগু-

নের শিখা দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেলো। স্যাঙারে এসেছে। ওর জন্যে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো আইভান। প্রাচীরের ভেতরে উঁচু একটা বেদীর ওপর বসেছিলো। আগুনটা লক্ষ্য করে একটা মুড়ি পাকানো কাগজ ছুঁড়ে মারলো সে। কাগজটায় লেখা : ৫ই অক্টোবর রাত দুটোর সময় আক্রমণ শুরু করতে হবে। ঐ সময় বলসিয়া ফটক খুলে দেয়া হবে।

চিরকুটটা পেয়ে আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না স্যাঙারে। সোজা হাঁটা ধরলো তাতার শিবিরের দিকে।

আইভান কেবল শয়তানিতেই পোক্ত নয়; ঝানু একজন রণ-কৌশলীও বটে। সরকারি বাহিনীকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে বলসিয়া ফটকের উল্টো দিকে, অর্থাৎ আঙারা নদীর তীর ঘেঁষে শহরের দক্ষিণ দিকে তাতার বাহিনীকে জড়ো করেছে সে। ৫ তারিখ রাত দুটোয় দক্ষিণ দিক দিয়ে তাতাররা কামান ছুঁড়তে শুরু করবে। হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে যাবে সরকারি বাহিনী। বলসিয়া ফটক ছেড়ে সৈন্যরা তখন দক্ষিণ দিকের আক্রমণ সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সেই সুযোগে বলসিয়া ফটক খুলে দিয়ে তাতার বাহিনীকে ভেতরে ঢোকাবে সে। এছাড়া আরো একটা শয়তানি বুদ্ধি মাথায় রয়েছে তার। আঙারার পানিতে কয়েক লাখ ব্যারেল ন্যাপথা ঢালার নির্দেশ দিয়েছে সে। তাতাররা আক্রমণ করার সাথে সাথে ন্যাপথায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। একদিকে আগুনের তাণ্ডবলীলা আর অন্যদিকে তাতারদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়বে সরকারি বাহিনী। আত্মসমর্পণ করতে তখন বাধ্য হবে তারা।

বলসিয়া ফটক থেকে সেনাবাহিনীকে যাতে দূরে রাখা যায় সেজন্যে আরো একটা চাল খেললো আইভান। গ্র্যাণ্ড ডিউককে

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠলো সে। ডিউক দেখলেন, আঙারার তীর ঘেঁষে অসংখ্য ছাউনি ফেলেছে তাতাররা। তার মানে আক্রমনটা আসবে শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে। বলসিয়া ফটক থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে শহরের দক্ষিণ দিকে জড়ো করতে আদেশ দিলেন তিনি।

৫ অক্টোবর। রাত দুটো বাজতে তখনো কয়েক মিনিট বাকি। আইভান ওগারেফকে দেখা গেলো প্রাসাদের ছাদে। এক হাতে দেশলাই আর অন্য হাতে তুলো পেঁচানো একটা লাঠি। তুলোর দিকটা ন্যাপথায় ভেজানো। দূরের গির্জায় রাত দুটোর ঘণ্টা বেজে উঠতেই তুলোয় আগুন জ্বেলে দিলো সে। তারপর সেটা ছুঁড়ে মারলো আঙারা নদী লক্ষ্য করে। চোখের পলকে সবকিছু ওলট-পালট হলে গেলো। রাতের আঁধার মুছে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠলো যেন। আগুন ছড়িয়ে পড়লো নদীর দু'তীর ঘেঁষে।

নদীতে আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো তাতারদের কামান। বৃষ্টির মতো গোলা এসে পড়ছে শহরের দক্ষিণ দিককার দেয়ালে। আচমকা আক্রমণে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও একটু পর সরকারি বাহিনীর গোলন্দাজরাও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করলো।

আগুন ততক্ষণে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। নদীর দু'ধারের কাঠের বাড়িঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। লোকজনের চিৎকার আর মেয়েলোকের কান্নায় রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গিয়েছে। আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে কিন্তু ন্যাপথার আগুনকে খুব সহজে বাগে আনা যাচ্ছে না।

বলসিয়া ফটক খুলে দেয়ার এই-ই উপযুক্ত সময়। —ভাবলো আইভান। এতক্ষণ সে প্রাসাদেই ছিলো; এবারে হাঁটতে হাঁটতে

ফটকের কাছাকাছি চলে এলো। ফটক পাহারায় রয়েছে ওয়াসিলি ফেডরের বিশ্বস্ত কিছু কর্মী। ফেডর নিজে দক্ষিণ দিকের আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত। এখন কোনো এক ছুঁতোয় প্রহরীদের ফটক থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফন্দি আঁটছে আইভান। এমন সময় একজন মেয়েলোককে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। মেয়েলোকটার সমস্ত শরীর বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। অন্ধকারে চেহারা ঠিক চেনা যাচ্ছে না। 'আরে, স্যাঙারে! তুমি এ সময় কোত্থেকে?' মেয়েলোকটাকে স্যাঙারে ভেবে বলে উঠলো আইভান। আসলে সে স্যাঙারে নয়—নাদিয়া। বরফের চাঁইকে ভেলা বানিয়ে ইরকুটস্কের দিকে আসছিলো নাদিয়া আর মাইকেল। হঠাৎ নদীর পানিতে আগুন জ্বলে ওঠায় বরফের চাঁই থেকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পানিতে। তারপর ডুব সাঁতার দিয়ে কোনোমতে তীরে পৌঁচেছে। সেখান থেকে দুজন পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে। কামানের গোলায় দক্ষিণ দিকের দেয়ালের অনেকটা ধসে পড়েছিলো, মাইকেলরা সেদিক দিয়েই শহরে ঢুকে পড়েছে।

'তোমার সমস্ত গায়ে পানি কেন, স্যাঙারে? যাও, প্রাসাদে গিয়ে ভিজে কাপড় পাল্টে এসো।'

'আইভান ওগারেফ!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো নাদিয়া।

ভীষণভাবে চমকে উঠলো আইভান। মেয়েটা তাহলে স্যাঙারে নয়! এগিয়ে গিয়ে খপ্ করে নাদিয়ার হাত ধরে ফেললো সে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'তুমি যে-ই হও না কেন, চিৎকার করেছো কি মরেছো।' নাদিয়াকে একরকম টেনেহিঁচড়ে প্রাসাদের দিকে নিয়ে চললো সে। যেতে যেতে একবারও পেছন ফিরে চাইলো

www.boiRboi.blogspot.com

না। তাহলে দেখতে পেতো, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পেছন পেছন কে যেন আসছে। লোকটা অন্য কেউ নয়—মাইকেল!

আইভান বুঝে ফেলেছে, নাদিয়াকে শেষ করে না দিলে নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাই প্রাসাদের একটা রুমে ওকে জোর করে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। কোমরের খাপ থেকে একটা ছোরা বের করলো। কি ঘটতে চলেছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না নাদিয়ার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে। নাদিয়ার চিৎকার শুনে হো হো করে হেসে উঠলো আইভান। বললো, 'তোর চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না, হারামজাদি। এবারে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ।' ছোরা হাতে এগিয়ে এলো সে।

রুমের এক দিক থেকে অন্য দিকে দৌড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে নাদিয়া। কিন্তু ক্লান্ত অবস্থায় নিজেকে বেশিক্ষণ রক্ষা করতে পারলো না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আইভান। সময় ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে মাইকেলের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠলো নাদিয়া। এক হাতে ওর গলা চেপে ধরে অন্য হাতে ছোরা তুললো আইভান। এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেলো দরজা। চমকে পেছন ফিরে চাইলো আইভান। দরজার এপাশে মাইকেল দাঁড়িয়ে—রাগে থর্-থর্ করে কাঁপছে সে।

নাদিয়াকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আইভান; দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মাইকেল স্ট্রগফ! এখনো বেঁচে আছো তুমি?'

'হ্যাঁ; তোর মতো নরকের কীটকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে এখনো বেঁচে আছি আমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো মাইকেল।

'বেশিক্ষণ আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না—এক্ষুণি যমের বাড়ি যাবি।'

পাঠিয়ে দিচ্ছি তোকে,' বলেই ছোরা ফেলে দিয়ে এক টানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো আইভান। মাইকেলের মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো সে। ঝট্ করে মাইকেল মাথা নিচু করায় আঘাতটা লাগলো দেয়ালে। ওদিকে ভয়ে কাঠ হয়ে আছে নাদিয়া। যে কোনো মুহূর্তে শয়তানটার তলোয়ারের আঘাতে একটা কিছু হয়ে যেতে পারে মাইকেলের। তলোয়ার হাতে শয়তানটার বিরুদ্ধে অন্ধ মাইকেল পারবে কেন? মনে মনে তাই ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলো সে।

প্রথম আঘাতটা ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষেপে উঠলো আইভান। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে তেড়ে এলো সে। মাইকেল ততক্ষণে আইভানের ফেলে দেয়া ছোরাটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে।

অবাক হলো নাদিয়া। আইভানও কম অবাক হয়নি। অন্ধ মাইকেল মেঝে থেকে কি করে ছোরাটা তুললো? তলোয়ারের আঘাত থেকে মাথাটাই বা সরিয়ে নিলো কিভাবে? তাহলে কি অন্ধ নয় সে? ভালো করে ওর চোখের দিকে চাইলো আইভান। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছে সে—ঐ তো মাইকেলের দু'চোখের মণি নড়ছে। নাদিয়ার উদ্দেশ্যে বললো মাইকেল, 'না, নাদিয়া। আমি অন্ধ হইনি—অন্ধের ভান করেছিলাম মাত্র।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না নাদিয়ার; মাইকেল তাহলে অন্ধ নয়! খুশিতে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

গর্জন করে উঠলো মাইকেল, 'শয়তান, যদি সাহস থাকে তো ডুয়েল লড়।'

ভয়ে সমস্ত গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে আইভানের। তবুও রণে ভঙ্গ দিলো না; তলোয়ার হাতে মাইকেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। আবারও কায়দা করে সরে গেলো মাইকেল। তলো-

www.boiRboi.blogspot.com

জানিয়ে গিয়েছিলো সে। ওকে বিদ্রূপ করে আইভান চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই চট করে সেটা পড়ে নিয়েছিলো। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো, সাইবেরিয়ার নিরাপত্তা এবং মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউকের জীবন—দুই-ই নির্ভর করছে তার ওপর। তাই পথ চলতে গিয়ে অনর্থক একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করেনি সে।

গ্র্যাণ্ড ডিউককে ঘটনার আগাগোড়া সবকিছু খুলে বললো মাইকেল। সব কথা শোনার পর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। নাদিয়াকেও কাছে টেনে নিলেন। বললেন, 'মা, ইরকুটস্কে নির্বাসিত বলে এখন আর কেউ নেই। তোমার বাবাও নির্বাসিত নন; দেশরক্ষা বাহিনীর একটা দলের অধিনায়ক তিনি।'

রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। একটু পরেই ভোরের সূর্য উঁকি দেবে। এমন সময় প্রাসাদে ফিরে এলো ওয়াসিলি ফেডর। আক্রমণের শুরুতে দক্ষিণ দিকেই যুদ্ধ করছিলো সে। সেখানে আরো অনেক সৈন্য থাকায় নিজের বাহিনী নিয়ে সে বলসিয়া ফটকের দিকে চলে এসেছিলো। ফটকের কাছাকাছি পৌঁছে চোখ কপালে উঠলো ফেডরের। দেয়ালের ওপাশে হাজার হাজার তাতার সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। একটু পরেই হয়তো আক্রমণ শুরু হবে। আর এক-মুহূর্তও দেরি না করে আক্রমণের আদেশ দিলো ফেডর। এরকম হঠাৎ আক্রমণের জন্যে তাতাররা বোধ হয় তৈরি ছিলো না। কারণ আইভানের কথামতো বলসিয়া ফটক থেকে সরকারি সেনাদলকে আগেই দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এছাড়া রাত দুটোর পর বলসিয়া ফটক খুলে দেয়া হবে—জানিয়েছিলো আইভান। তাই হঠাৎ আক্রমণ আসাতে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়লো তাতার বাহিনী। পিছু হটার চেষ্টা করলো—কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি

হয়ে গিয়েছে। কয়েক হাজার তাতার সেনার মৃতদেহ পেছনে ফেলে বাকিরা রণেভঙ্গ দিলো।

আইভানের মৃত্যুর খবর তাতার শিবিরে পৌঁছনোর সাথে সাথে গুম মেরে গেলো কিওফার খান। হঠাৎ করেই দক্ষিণ দিক থেকে তাতারদের আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেলো। আইভানের মৃত্যুতে গোটা তাতার বাহিনীর মনোবল গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কেউ সামনে এগুতে চাইছে না। তাই আর দেরি না করে তাতারদের পিছু হটার নির্দেশ দিলো কিওফার খান।

রাতের আঁধার মুছে গিয়ে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। বলসিয়া ফটকের ওপাশে কয়েক হাজার তাতার সেনার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। ফটকের একেবারে কাছে একজন মেয়েলোকের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলো মাইকেল। দেহটা উপুড় হয়ে থাকায় চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। একেবারে কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দেহটা উল্টে দিতেই চেহারাটা চেনা গেলো—স্তাঙারে। গুপ্তচরগিরির উপযুক্ত পুরস্কারই পেয়েছে সে।

৭ অক্টোবর ভোরবেলা কামানের আওয়াজ শোনা গেলো—ইয়াকুটস্ক থেকে সরকারি বাহিনী এসে পড়েছে। খবরটা কিওফার খান শুনতে পেয়ে আর দেরি করলো না; তাড়াতাড়ি শিবির গুটিয়ে বোখারার দিকে রওনা দিলো। কিন্তু অতো সহজে পালাতে পারলো না তারা। রাস্তাঘাট সব বরফে ঢেকে গিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গার সেতু কিংবা কাঠের সাঁকোগুলো তাতাররা আগেই ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এখন নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে আটকা পড়েছে। এ অবস্থায় কিছু সৈন্যসহ পাহাড় পর্বত আর বন জঙ্গল পেরিয়ে বোখারায় পৌঁছলো কিওফার খান। বাকিদের কেউ কেউ মারা

www.boiRboi.blogspot.com

পড়লো প্রচণ্ড শীতে। কেউবা প্রাণ হারালো সরকারি বাহিনীর হাতে।

ইয়াকুটস্ক থেকে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে দুই সাংবাদিক, জুলিভেট আর ব্লাউন্টও এসেছে। তাতাররা ভেলা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর সময় ওরাও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সাঁতরে তীরে উঠে ইয়াকুটস্কে না এসে ওরা চলে গিয়েছিলো ইয়াকুটস্কের দিকে। নাদিয়া আর মাইকেলকে বহাল তবিয়তে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি হলো ওরা। মাইকেল সত্যি সত্যি অন্ধ হয়নি জেনে খুশির চোটে ওরা বুকে জড়িয়ে ধরলো মাইকেলকে। জুলিভেট তার নোট বইতে লিখলো: কখনো কখনো তাতানো তলোয়ার দিয়েও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করা যায় না।

কিছুদিন পরের কথা। সরকারি বাহিনী তাতারদের হটিয়ে দিয়ে এবারে সেতু আর রাস্তা মেরামতের কাজে নেমেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তায় জমে থাকা বরফের আস্তরগুলো সরিয়ে ফেললো ওরা। সেতুগুলোও গাড়িঘোড়া আর লোক চলাচলের উপযোগী করে তুললো।

গ্র্যাণ্ড ডিউক মস্কোয় তার ভাইয়ের কাছে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু ছোট একটা অনুষ্ঠানে তাঁকে উপস্থিত থাকতেই হচ্ছে। তাই কদিন পরেই মস্কো যাবেন বলে ঠিক করলেন তিনি। অনুষ্ঠানটা আর কিছু নয়—বিয়ে!

গ্র্যাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ। মাইকেলরা এখন ডিউকের অতিথি হিসেবে এই প্রাসাদেই রয়েছে। একদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আলাপ হচ্ছিলো নাদিয়া আর মাইকেলের মধ্যে। একটু দূরে ওয়াসিলি ফেডর বসে। মাইকেল বললো, 'ঈশ্বরের লীলাখেলা বুঝা বড় শক্ত, নাদিয়া। তা না হলে আমাদের দুজনের মধ্যে

পরিচয়ই বা হবে কেন আর একজন আরেকজনের সঙ্গে এভাবে জড়িয়েই বা পড়বো কেন ? কোথায় রিগা আর কোথায় ওমস্ক !'

নাদিয়া কোনো উত্তর দিলো না দেখে মাইকেলই আবার বললো, 'অনেক ঝড় ঝাপটা গিয়েছে আমাদের ওপর দিয়ে। দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়িও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু কি আশ্চর্য ! ঈশ্বরের ইচ্ছেয় শেষ পর্যন্ত আমরা আবার একসাথে হলাম। তাঁর হয়তো ইচ্ছে ; বাকি জীবনটাও আমাদের একসঙ্গে গাঁথা হোক। কিছু বলো, নাদিয়া ?'

মাইকেলের কথা এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো, এবারে নিজেকে আর সামলাতে পারলো না নাদিয়া, ঝাঁপিয়ে পড়ে মাইকেলের বুকে মুখ লুকালো সে। বললো, 'ঈশ্বরের ইচ্ছেয় বাধ সাধবো কোন্ সাহসে। কিন্তু আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হবে তো, মাইকেল ?'

কোনো উত্তর দিলো না মাইকেল। নাদিয়ার মুখটা নিজের বুকের সাথে আরো জোরে চেপে ধরলো সে। ওদের বেশ খানিকটা দূরে ওয়াসিলি ফেডর বসে। চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে বিড়্‌বিড়্‌ করে কি যেন বলছে সে।

ইরকুটস্কের গির্জায় বিয়ে হয়ে গেলো ওদের। গ্র্যাণ্ড ডিউক সহ বিয়েতে ইরকুটস্কের গন্যমান্য সবাই উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের সমস্ত তদারকিতে ছিলো জুলিভেট আর ব্লাউন্ট। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর জুলিভেট বললো, 'ব্লাউন্ট, বয়স তো কম হলো না আপনার ; তো শুভ কাজটা এখনো সারছেন না কেন ?'

'মেয়ে পাচ্ছি কই, বলুন ? আপনার মতো আমার তো কোনো দূর সম্পর্কের বোন নেই যে, ঝটপট কাজটা সেরে ফেলবো,' খোঁচা মেরে উত্তর দিলো ব্লাউন্ট।

'কথাটা বলেছেন খাসা ; কিন্তু আমার সেই বোন জীবনে নাকি বিয়েই করবে না।'

'থাক ওসব কথা। এখন বলুন তো, খবর জোগাড়ের জন্যে এবারে কোন্ দিকে যাওয়া যায় ? রাশিয়ায় নতুন আর কিছু মিলবে না। এখন শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে চলুন কোনো একদিকে বেরিয়ে পড়ি।'

'শুনলাম লণ্ডনের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নাকি ভালো যাচ্ছে না। কূটনৈতিক সম্পর্কও প্রায় নষ্ট হবার পথে ; যাবেন নাকি, চীনে ?'

'যাবো কি বলছেন। এক্ষুণি রওনা হবো। চলুন তার আগে সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আসি,' বলে ব্লাউন্টের হাত ধরে বেরিয়ে গেলো জুলিভেট।

মাইকেলদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জুলিভেট আর ব্লাউন্ট চীনের দিকে রওনা দিলো। এদিকে মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে ওয়াসিলি ফেডরও তৈরি। রিগা যাবার জন্যে রীতিমতো ছটফট করছে সে। এবারে ঘোড়াগাড়ির বদলে স্লেজ—কারণ এ কদিনে সাইবেরিয়ার পুরোটাই বরফে ঢেকে গিয়েছে।

রাস্তাঘাটের কোনো বালাই নেই। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বরফ আর বরফ। মাইকেলদের স্লেজ ছুটে চললো সাঁ সাঁ করে।

নিকোলাসকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছিলো সেখানে খানিকক্ষণ থামলো ওরা। দুটো কাঠ জোড়া দিয়ে একটা ক্রুশ বানালো নাদিয়া। যত্নের সাথে সেটা গেঁথে দিলো নিকোলাসের কবরে। কয়েক মিনিট প্রার্থনা করলো সবাই। তারপর আবার শুরু হলো যাত্রা। কদিন একটানা চলার পর স্লেজ পৌঁছলো ওমস্কে। বুড়ি মার্ফা ছেলে আর ছেলের বউকে পেয়ে বেজায় খুশি। বেশ কদিন

www.boiRboi.blogspot.com

ওমস্কে কাটালো ওরা ; তারপর আবার শুরু হলো যাত্রা।

মস্কোয় পৌঁছে জারের সঙ্গে দেখা করলো মাইকেল। সমস্ত ঘটনা আগেই জেনে গিয়েছিলেন মহামান্য জার। তাই মাইকেল মস্কো পৌঁছতেই একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে মাইকেলকে তিনি নিজহাতে "সেন্ট জর্জ ক্রস্" পরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন মাইকেলের উঁচু পদ মর্যাদা।

পরবর্তী সময়েও মাইকেল বহু খেতাব পেয়েছিলো তার অসাধারণ বীরত্বের জন্যে। সেসব অন্য কাহিনী। এখানে তা না বললেও চলবে।

www.boiRboi.blogspot.com

আলোচনা

তানভীর, মনি।
কালিকাপুর, পটুয়াখালী।

আমাদের একটা অনুরোধ, কুয়াশা ৭৬-এ যেন আমাদের কুয়াশা সিরিজের প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ স্যানন ডি-কস্টা সাহেব থাকেন।

মাসুদ,
এফ/৬/১১ সি, জি, এস কলোনী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

'অশুভ সংকেতের পর' প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকদিন কেটে গেল, এখনো এর পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করছেন না কেন?

* 'শেষ অশুভ সংকেতে'র জন্যে আরও দু'তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।

মোঃ ওসমান সরকার (অপু),
১০, কলাবাগান (১ম লেন), ঢাকা-৫।

দীর্ঘ তেরো বছর পর আজ আবার পড়লাম মার্ক টোয়েন-এর 'টম সয়ার'। খুবই আনন্দ হচ্ছে এবার নিজের সংগ্রহে বইটি রাখতে পারছি বলে। সেই সময় কলকাতায় ছাপা বইটি এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনে পড়েছিলাম। তখন খুব দুঃখ হতো এরকম একটা বই-এর গর্বিত মালিক হতে পারিনি বলে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হলেও সেবা আমার সে প্রত্যাশা পূরণ করেছে। যদিও এখন আর সেই ছোট্টটি নই, তবুও বইটি পড়তে গিয়ে বার বার টম সয়ারের মাঝে খুঁজে ফিরেছি আত্মপ্রকৃতি।

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com